অচেনা

বুদ্ধদেব বসু

সুরভি প্রকাশনী
১, কলেজ রো, কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ : ২৬ জানুআরি ১৯৬১

প্রকাশক : শ্রীসরোজবরণ মুখোপাধ্যায়
সুরভি প্রকাশনী
১ কলেজ রো, কলকাতা ৯

গ্রন্থন : মোসলেম খান্ অ্যাণ্ড ব্রাদাস্

ব্লক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এন্‌গ্রেভিং কোং
মুদ্রন : চয়নিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রবীরকুমার ধর
শাশ্বতী প্রেস,
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৯

প্রচ্ছদপট : শ্রীগণেশ বসু

দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু

হাল আমলের স্বল্পায়ু সিনেমা ও সাহিত্য সংক্রান্ত "বিচিত্রা" কাগজে পরিধূসর নামে এই নাতিপরিসর উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। বর্তমানে অচেনা নাম নিয়ে এটি সংস্কৃত চেহারায় আত্মপ্রকাশ করলো।

সামাজিক পটভূমিতে এই শতকের একটি জ্বলন্ত সমস্যার প্রতি পাঠকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করা হয়েছে,—পাঠকসমাজ সেদিকে স্বল্প ভাবনায়ও যদি ভাবিত হন—তাহলে লেখকের উপরি পাওনা ঘটবে—বলাই বাহুল্য।

বইটির প্রকাশ-ব্যাপারে কয়েকজন বন্ধুর কাছে আমি ঋণী। বিশেষ করে সর্বশ্রী অনিলচন্দ্র সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, সুনীলকুমার ঘোষ এবং রথীন্দ্র পালিত। এঁরা আমার বিশেষ বন্ধু, এঁদের কাছে নিয়মতান্ত্রিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

এই লেখকের অন্য উপন্যাস

পুষ্পলাবী

বসন্তের সংগে মালতীর যখন প্রথম দেখা হয়েছিল—তখনকার সেই নাটকীয় মুহূর্তটি আজো বসন্তের মনে মাঝে মাঝে আচমকা এক রোমাঞ্চের ঝড় তোলে। কখনো সখনো মনে পড়লে অবশ্য। বসন্তকে নানা কাজের ঝামেলায় ঘুরতে হয়, কাজের চেয়ে অকাজের ঝামেলাও কম নয়। তারি মাঝে হঠাৎ কখনো মালতীর কথা মনে পড়ে, প্রথম আলাপের সৌরভটুকু মনকে ঈষৎ শ্যামল করে তোলে। যেমন উত্তপ্ত বৈশাখ সন্ধ্যায় হঠাৎ এলোমেলো ঠাণ্ডা বাতাস আবহাওয়াকে স্নিগ্ধ করে দেয়।

চাকরীর জন্য ইণ্টারভিউ দিতে গেছে দুজনেই—এক অফিসে একই পদের জন্যে। সকলের ডাক হলো, কিন্তু মালতী আর বসন্তের ডাক হলো না। খোঁজ নিয়ে জানা গেল মালতী মিত্র নামে আর একটি কোন্ মেয়ে যেন ইণ্টারভিউ দিয়ে গেছে গোড়ার দিকে, আর বসন্ত ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে পুলিশী রিপোর্ট হয়তো খুব সুবিধের নয়। বার দুই রাজবন্দী ছিল, সুতরাং সরকারী কাজে তাকে নিয়োগ করা বোধহয় সুবিবেচনার কাজ হবে না।

মালতী আগে কথা বলেছিল, একে একে সকলেরই ডাক পড়লো—শুধু আমাদের দুজনের—

বসন্ত ঠিক বুঝতে পারেনি মালতী তাকে উদ্দেশ্য করেই ওই কথা কটি বলেছে। একটু পরে যখন দেখা গেল যে ঘরে বসন্ত আর মালতী ছাড়া আর কেউ নেই সে বুঝতে পারলো তারই উদ্দেশে কথাগুলি বলা হয়েছে। একটু মনোযোগ দেবার ভংগীতে জবাব দিল, আমি ত' জানতুম আমারা ডাক হবে না, তবু একটা ক্ষীণ আশা—একজন নামী লোকের রেকমেণ্ডেসন নিয়ে এসেছিলাম। যদি সুযোগ পাই—এই ভরসায়।

কিন্তু আমার কেসটা বড় ইণ্টারেষ্টিং। একই নামে আর একটি মেয়ে আমার পরিবর্তে ইণ্টারভিউ দিয়ে গেছে! সহজ হাসির এক ঝলক খুসির হাওয়া ছড়িয়ে দিয়ে যেন মালতী কথাগুলি বলে উঠলো।

তাই নাকি? ভারি মজার ব্যাপার ত!

তাই ত' শুনছি!

যদি কিছু মনে না করেন,—মানে, কি নাম আপনার জানতে পারি? কুণ্ঠিত স্বরে বসন্ত জিজ্ঞাসা করলো।

মালতী একবার তার দিকে তাকাতে বসন্ত চোখ নামিয়ে নিল।

মালতী মিত্র! নাম শুনে বসন্ত মালতীর আপাদমস্তক লক্ষ্য করে বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সকালের দিকে ত'—এই নাম ধরে খুব হাঁক-ডাক হয়েছিল। তখনো বুঝি আপনি এসে পৌঁছতে পারেন নি?

কিন্তু আমার নামে অন্য কোন্ মেয়ে যাবে ইণ্টারভিউতে বলুন?

কার কোথায় কি চাকরীর জন্যে ইণ্টারভিউ হচ্ছে তার সন্ধান রেখে একদল বেকার ছেলে মেয়ে সেই অফিসের কাছে ঘোরা ফেরা করে—সুযোগ পেলে বা কেউ অনুপস্থিত থাকলে সেই জায়গায় প্রক্সি দিয়ে আসে, মনোনীত হলে ঐ নামে চাকরীও করে।

ঠিক বিস্মিত হ'ল কিনা বোঝা গেল না, তবে বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করে মালতী বলল, সে কী! একই নামে অন্য কোন মেয়ে চাকরী করে যাবে, এ ত' মজার কথা!

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, অফিসের দারোয়ান এসে জানিয়ে গেলো—ছ'টা বেজে গেছে। অফিস ছুটী হয়ে গেছে, আর এখানে থাকতে দেওয়া হবে না কাউকে।

মালতী একটু রুষ্ট হয়েছে দেখে বসন্ত বলল, এ ত' গলা ধাক্কা দেওয়া বা ঐ জাতীয় কোন অপমান নয়, শুধু নিয়ম রক্ষা। দোষ আমাদেরই। চলুন পথে দাঁড়াই।

মালতীর মুখেও যেন কথা জুগিয়ে গেল। কেমন ধারা

প্রগল্‌ভ স্খলিত বাক হয়েই সে বলে ফেলল, কিন্তু পথে ত' মানুষ দাঁড়ায় না। চিরদিন শুনে আসছি—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বসন্ত বলল, পথে বসে। তাই না?

পথে বেরিয়ে ওরা দেখল কাল-বৈশাখীর আসন্ন দুর্যোগে সন্ধ্যার আকাশ থম থম করছে। কালো মেঘে দিনের আলো নিভে গেছে। একটা উদ্দাম রুদ্রলীলা যেন অপেক্ষা করছে। দৌড়ের প্রতিযোগীরা যেমন স্টার্টারের বাঁশীর প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি।

একটু জোরে পা চালিয়ে চলুন, ঝড় আসছে, বসন্ত বললে।

আসুক না! অন্য একটি মেয়ে এসে ইণ্টারভিউ দিয়ে গেল, চাকরীটা ফস্কাল। এর চেয়ে বড় দুর্যোগ কী আর ঝড় আনতে পারবে?

দেখুন, আমিও গিয়েছিলাম। যদি সুযোগ পাই তো অন্য কারুর নামে ইণ্টারভিউ দেব এই ভেবে। যিনি আসেন নি—এমন একজনের নামে চলে যাবো, কিন্তু পুরুষ মানুষ সকলেই এসেছিলেন। পথ চলতে চলতে বসন্ত নির্বিকারে এ কথা ঘোষণা করলে।

কিন্তু আপনি না বললেন যে একজন খুব বিখ্যাত লোকের কাছ থেকে মুরুব্বিনামা এনেছেন।

মুরুব্বিনামা? ও রেকমেণ্ডেসন। হ্যাঁ—হ্যাঁ, কিন্তু সে ত' কারুর নামে নয়, দিস জেণ্টল ম্যান্ ইত্যাদি···কাঁচা কাজ করিনি। দেখবেন নাকি?

থাক। তার দরকার নেই। বলে মালতী চুপ করলে।

বসন্ত জিজ্ঞাসা করলো, আপনি যাবেন কোন দিকে?

আমি? দক্ষিণে! টালীগঞ্জে থাকি। চলুন ধর্মতলা পর্যন্ত এক সঙ্গে হেঁটে যাই।

আমিও ত' দক্ষিণে থাকি—তবে খুব দক্ষিণে। বাঁশদ্রোণী চেনেন? যার ডাক নাম বাঁশধনি?

না।

টালীগঞ্জেরও দক্ষিণে। আমার এক জ্ঞাতি মামা সেখানে বাড়ী করেছেন। আপাততঃ তাঁরই একটা অকেজো ঘরে আস্তানা নিয়েছি। চলুন—না হয় আপনার সংগে ধর্মতলা পর্যন্ত আমিও হাঁটি। বাসের দুটো পয়সা অন্তত বাঁচবে ত'!

মালতী চুপ করে রইল। পাশাপাশি তারা দুজনে ধীর পায়ে হাঁটছে। উদ্দাম এলোমেলো দমকা হাওয়ায় মালতীর মাথার চুল এদিক থেকে ওদিকে সরে যাচ্ছিল।

পশ্চিম দিগন্তে একখণ্ড কালো মেঘ কেমন করে সম্পূর্ণ আকাশ ব্যাপ্ত করে ফেলেছে। ঝড়-ত্রস্ত পথচারীর মধ্যে একটু দ্রুততা, একটু ব্যস্ততা দেখা গেল। ওপরে শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী বাসায় ফিরছে। তারাও ভয়-চকিত। গাছে গাছেও প্রকৃতির তাণ্ডবের বাজনা বেজে উঠছে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর মালতীই প্রথম কথা বলল, আপনি কি ভাবছেন বলুন ত'? খুব যেন গম্ভীর হয়ে পড়েছেন। ইণ্টারভিউ না পেয়ে হতাশ হয়েছেন বুঝি?

বসন্ত একটু বিমনা হয়েছিল সত্যি, এবং তা হয়েছিল মালতীর বিষয় নিয়ে চিন্তা করতেই। এক কাপ চা খাওয়ানোর জন্য অনুরোধ করা সমীচীন কিনা, কিম্বা না খাওয়ালে মালতী অভদ্র ভাবতে পারে; আবার হয়তো অনুরোধ করলে তাকে প্রীতি-লুব্ধ মনে করে বসে—কে জানে! তাছাড়া শুধু এক কাপ চা'ই খাওয়াতে পারে সে, তার বেশী আর উঠতে পারে না। সে প্রস্তাব সভ্যতাসম্মত কিনা, এবং মালতী রাজী হলে শুধু চা খাওয়ানোর দৈন্য বসন্তকে মলিন করে দিতে পারে—সমস্ত ভাবনায় সে কাতর হয়ে পড়েছিল।

তবু বসন্ত মুখে বললে, না, না, হতাশ হইনি। ভাবছি অদৃষ্টের কি পরিহাস!

মালতী কিছু না বুঝে তার মুখের দিকে তাকালো। ক্লান্তির একটা ছোপ পড়েছে বসন্তের মুখে। বেকার মানুষের লাবণ্য থাকা

অশোভন হলেও যৌবন রসের লালিত্যটুকু একেবারে বেইমানি করে তার মুখ থেকে অপসৃত হয় নি। কপালের ঘাম চোয়াল বেয়ে পায়ের দিকে পথ করে নেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শেষ বৈশাখের সন্ধ্যের এই এলোমেলো ঠাণ্ডা হাওয়া ঘাম শুকিয়ে দিয়েছে। শুধু ধুলোর একটা ছোপ আর ঘামের রেখাটুকু মুছে যায় নি। শ্রান্তিতে ভেজা, ক্লান্তিতে মলিন সেই মুখের স্নিগ্ধতাটুকু ভারি ভালো লাগল মালতীর।

বসন্ত মালতীর দিকে না চেয়েই বলে চলল, পরিহাস কেন বলছি বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারলেন না! আমি প্রক্সি দিতে এসেছি—পারিনি, আর আপনারটা অন্য কে প্রক্সি দিয়ে গেল—ধরতেও পারা গেল না। পরাজিত আমরা দুজনেই। তাই না?

মালতী আর একবার বসন্তের মুখের দিকে তাকালো। তার মুখে শুধু লালিত্যের স্পর্শ নেই, চোখ দুটিও কেমন যেন মদির, হয়তো বা করুণ আর অসহায়।

মালতী গভীর বেদনা বোধ করলো বসন্তের জন্য। মায়া হলো তার। কিছুক্ষণের আলাপ—তবু মনটায় একটুখানি মোচড় লাগলো!

এর পরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। হঠাৎ ধুলোঝড় শুরু হতেই বাধ্য হয়ে দুজনে একটা কাফেতে আশ্রয় নেয়। বসন্তের এক কাপ করে চা খাওয়ার প্রস্তাবে মালতী খুসিই হয়। স্বল্পকালস্থায়ী ঝড় জলের পর মালতী বসন্তের ঠিকানা জানতে চেয়েছিল, কিন্তু বসন্ত দেয়নি। বরং মালতীই তার হদিস জানিয়ে যাক—যদি কোথাও কোন সুযোগ মেলে ত' সে তাকে জানাবে। মালতী ঠিকানা দিয়ে সেদিনের মত চলে গেল।

নাটকের সূচনা এইটুকু।

মাঝে মাঝে মালতীর কথা বসন্তের মনে না হয়—এমন নয়। একটু বুঝি বা বেদনাও জাগে, একটুখানি ভালোও লাগে। প্রিয়দর্শনা একটি অসহায় তরুণীর কোন উপকারে যদি সে আসতে

পারে, এজন্যই হয়তো তার মন কেমন করা। এর বেশী কিছু নয়। একটা মিথ্যা ভাষণের মাধ্যমে অবস্থাকে নাটকীয় করে তোলার মধ্যে দুজনের আলাপের শুরু। তাকে নিয়ে মনে মনে কাব্য রচনা করা বোধহয় ঠিক হবে না। তবু মালতীর কথা ভাবতে মন্দ লাগে না বসন্তের। প্রথম আলাপেই মিথ্যা ভাষণ করেছে মালতীর কাছে, সেজন্যে মনটায় একটু যে বেদনার খোঁচ থাকে না এমন নয়। —অফিসের ইন্টারভিউতে বসন্তের যাওয়ার দরকার নেই, এটা পরে ঠিক হয় এবং আগে ইন্টারভিউ চিঠি পাঠানো হয়। বসন্ত সে ঘটনাটি চেপে গিয়েছিল। মিথ্যা একটা আশা; বরং হতাশা-ই বলা যায় তাই নিয়ে সে গিয়েছিল, এবং যথার্থই তার কাছে একটা জোরালো মুরুব্বিনামা ছিল। একবার কোন ক্রমে সব শেষেও যদি সে ভেতরে ঢোকবার ব্যবস্থা করতে পারতো, এইটুকু আশা ছিল।

চাকরী তার একটা জোগাড় করতেই হবে। বি, এ, ফেল করা সাধারণ একটি ছেলের জন্য চাকরি সাজিয়ে নিয়ে অবশ্য কেউ বসে নেই, বিশেষতঃ এই বাজারে। অথচ এখনো পাকিস্তানে বুড়ি মা, জ্যাঠাইমা আর এক পিসিমা পড়ে আছেন। তাদের কোলকাতায় এনে বাসা বাঁধতে হবে এবং তা করতে হবে অত্যন্ত দ্রুত। সুতরাং চাকরি তাকে যে ভাবে পারুক, জোগাড় করতে হবে। তাছাড়া তার জ্ঞাতি মামা হরিশরণবাবুও খুব তাগিদ দিচ্ছেন তাঁর অকেজো ঘরটা ছাড়ার জন্য। একদিন মামার সংসারে বসন্তের থাকার দরকার ছিল —তাই তিনি তাকে স্থান দিয়েছিলেন। বাঁশদ্রোণীতে বাড়ী করার সময় চুন সুরকি সিমেন্টের তদারকিতে বসন্তের প্রয়োজন ছিল। তখন হরিশরণ মামা তার খোরাকিরও ব্যবস্থা করেছিলেন। বাড়ী হলো। চুণ সুরকি রাখার গুদাম ঘরটা, যেটা ভেঙে ছেলেদের পড়ার ঘর হবে, সেখানে কোন রকমে একটা মাতুর আর একটা সুজনি বিছিয়ে বসন্ত রাতটা কাটাত। গৃহপ্রবেশের পর থেকে তার খাবার ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছেন মামা। পাইস হোটেলের সাহায্য তাকে নিতে হয়েছে এখন।

হরিশরণ মামাই চাকরির জন্যে সচেষ্ট হতে বলেন বসন্তকে। বলেন—আজকালকার ছেলে ছোকরারা বুঝলে বসন্ত, একেবারে হাঁদা গঙ্গারাম। বসে বসে আর কদিন চালাবে বলো? ঘড়ার জল গড়িয়ে খেলে ক'দিন আর চলবে হে?

বসন্ত সরে আসে নির্লিপ্ত হয়ে; সামনে দাঁড়ালে তার মামা কর্মজীবনে কি কি অসাধ্য এবং অদ্বিতীয় কাজ করে একেবারে রিক্ত অবস্থাকে এমনধারা বিত্তবান করেছেন—যার জোরে বাঁশদ্রোণীতে আড়াই কাঠা জমি এবং আড়াই কামরার একতলা একটি প্রাসাদ বানিয়েছেন, এই ফিরিস্তি শোনাবেন। বসন্তর বহুবার সে কাহিনী শোনা আছে, এমন কি কয়েকটি জায়গা তার মুখস্থও হয়ে গেছে।

একটা কিছু জোগাড় করতে পারলে সে যে বাঁশদ্রেণী ত্যাগ করতে দ্বিধা বা দেরী করবে না একথা তার মামাও জানেন। জেনেও তবু মাঝে মাঝে বলেন, নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা কর হে ছোকরা! চিরটাকাল কি মামার ঘাড়ে ভর করে থাকবে?

সে কিন্তু জবাব দেয় না। কোন রকমে এক আধটা টিউশনি জোগাড় করে, যা বিশ পঁচিশ টাকা পায়, ডাকটিকিট কেনে, দরখাস্ত ছাড়ে, বাসভাড়া দেয় আর যদি কিছু বাঁচে ত' তাই দিয়ে পাইস হোটেলে দু' চার মুঠো খেয়ে আসে। হ্যাঁ, আর একটা কু-অভ্যাস করে ফেলেছে সে—তার জন্যে মাঝে মধ্যে দু'চার আনা ব্যয় হয়। মাঝে মাঝে সে মোদক খায়।

যখন সব আশা ফুরিয়ে যায়, চাকরির দিবা স্বপ্ন সৌখিন কাঁচের খেলনার মতো ভেঙে খান খান খান হয়ে যায়, তখন সব কিছুকে ভুলে, সব দুঃখকে জয় করে মনকে সুস্থভাবে বেঁধে রাখার মতো শক্তি হারিয়ে যায় বসন্তের। বাধ্য হয়ে সে মোদকের দাসত্ব গ্রহণ করে। জীবন আবার স্বপ্ন-রঙীন হয়। চাকরি না পাওয়ার দুঃখ, মামার তির্যক নির্যাতন, মা, জেঠিমা, পিসিমার পাকিস্তানে পড়ে থাকার বেদনা—সব মিলিয়ে জীবনের গভীর হতাশা কোথায় যেন মিলিয়ে যায়। রঙছুট পরিবেশ বর্ণ-বিভংগে ঝলমলিয়ে ওঠে!

তাছাড়া সংসর্গ দোষ আছে। কয়েকটি বেকার বখাটে আর বোম্বেটের সংগে প্রথম থেকেই তার আলাপ জমে উঠেছিল। বেকার বলেই তারা বোম্বেটে হয়েছে, দরিদ্র আর সুযোগবঞ্চিত বলেই তারা বখাটে হয়েছে। বসন্তও লেখাপড়া কিছুদূর না শিখলে ওদেরই একজন হয়ে যেত। এখনও সে আছে ওদেরই একজন হয়ে। কিন্তু দু'কথা ইংরিজিতে বলতে পারে, দু'চার পাতা যা হোক ইংরেজি লিখতে পারে। আর সেজন্যই সে ওদের লীডার হয়ে রয়েছে। ওরা পয়সা ধার দেয়, ছোট খাটো কাজকর্ম সেরে দেয়। অন্ততঃ হরিশরণ মামার বাড়ী তৈরির সময় অনেক টুকিটাকি কাজ তারা করে দিয়েছে। এদেরই পাল্লায় পড়ে কখনো সিগারেট, কখনো সিদ্ধি, কখনো তাড়ি এইরকম করতে করতে এখন মোদকে এসে ঠেকেছে।

বিধবা মা-জেঠিমা মাঝে মাঝে চিঠি লেখেন। পিসিমা কোন পত্র দেন না। লিখতে জানেনও না, আর মা-জেঠিমা যা লেখেন তা থেকে ভিন্ন কথাও কিছু আর নেই যা নতুন করে লেখা চলতে পারে। মা প্রায়ই লেখেন—ওরে বাসু, আমি মরলে কি তুই সংসার করবি? আমরা তিন বুড়ি যে বাবা তোর আশায় বেঁচে আছি। তোর জেঠিমার চোখে ছানি পড়েছে, বোধহয় বেশীদিন আর দেখতে পাবে না। আমারও চালসে ধরেছে, কাছেরটা খুব ঝাপসা দেখি। আমরা কি তোর বউ দেখে যেতে পারব না? সেই আশাতে আজো প্রাণ ধরে আছি। আর একটা সাধ আছে, মরার আগে কোলকাতাটা দেখার। ওখানে বাসা করতে পারিস না পারিস—একবার যেন নিয়ে যাস আমাদের। একবার কালীঘাটের মায়েরে দেখাস!

শুধু লেখা নয়। মা বার বার বলেছেন, বসন্ত তোর একটা হিল্লে না করে যে মরতে পারছিনে! তোর বাবার কথাটা একবার ভাব, যাবার সময় তোর জন্যে কত না কষ্ট পেয়ে গেল,—কত বলে গেল—

বসন্তের সে সব অবশ্যই মনে আছে। বংশের একমাত্র সন্তান, বাবা আর জ্যাঠামশাই তাকে যে কি রকম ভালবাসতেন—তার স্মৃতি

দ্রুত মন থেকে মুছে যাবার নয়। ওঁরা দুজনেই তার ভবিষ্যতের স্বপ্ন আঁকতেন। জ্যাঠামশায়ের ইচ্ছে ছিল সে পুলিশ দারোগা হয়। পল্লী গ্রামে পুলিশ দারোগার চেয়ে শক্তিমান আর কেবা কে। সবাই ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকবে। বসন্ত সদর্পে পুলিশী পোষাক পরে গটমট করে হাঁটবে। বাবার ইচ্ছে ছিল বসন্ত মস্ত বড় পণ্ডিত হবে। তিনি মহাপুরুষদের জীবনী পড়তেন, তাদের বাল্যকাল কেমন করে কেটেছে, সেই সব আদর্শ ও গুণের কোনটা কি করে পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয় সে চেষ্টায় ব্যাকুল হতেন।

জ্যাঠামশাই সর্পাঘাতে আর বাবা কলেরায় তাদের মায়া কাটান। এই দুটি মৃত্যু এমনই অসঙ্গত এবং এতই দ্রুত অতর্কিতভাবে ঘটে গেল যে নাবালক বসন্তের মানুষ হওয়ার কোন পাকা ব্যবস্থা কেউই করে যেতে পারলেন না। এমন কি যজমান যে কোথায় কত ঘর আছে তার পূর্ণ তালিকাও দিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। সে ত' তবু দূরের কথা ছেলেটার পৈতে পর্যন্ত করিয়ে যেতে পারেননি ওঁরা।

মা খুঁজে পেতে এক জ্ঞাতি ভাই হরিশরণকে বের করলেন বছর কয়েক পরে। এবং তাঁর কাছে কেঁদে কেটে পড়ে বুঝিয়ে দিলেন, যদি বসন্তের বাবা জ্যাঠা বেঁচে থাকতো—তাহলে সে কি রকম আদরের বস্তু হতো। অথচ বয়স পেরিয়ে গেল ছেলেটার পৈতে হলো না আজো। জাত যেতে বসেছে যে।

হরিশরণ বিষয়ী লোক কিন্তু তখনো তিনি নিজের বিষয়ী-বুদ্ধির দৌলতে কোন বিষয়ের মালিক হতে পারেন নি, বরং মামলা মোকদ্দমায় যা ছিল—তা হারিয়ে বসেছেন। তিনি কোলকাতার একটা ঠিকানা দিয়ে বোনকে গভীর সান্ত্বনা দিলেন। সহানুভূতি জানিয়ে অবশেষে বললেন—দিস পাঠিয়ে, দেখবো 'খন।

কিন্তু হরিদা, ওর যে এখনো পৈতে হয়নি!

সব হবে। কোলকাতা হচ্ছে মহানগরী, তুই অত উতলা হোস নি। ওখানে গেলে সব ফস্ করে হয়ে যায়।

তা দাদা, তুমি সংগে নিয়ে যাও—মায়ের সে আকুল আবেদন আজো বসন্তের কানে স্পষ্ট হয়ে আছে।

সে কি করে হবে রে! আমি যে এখন এখানের কাজে ব্যস্ত। ফিরতে ছ'মাস লাগবে, তুই পরে ওকে কোলকাতায় পাঠাস। বুঝলি?

মার কাছে কোলকাতায় পাঠাবার পয়সা ছিল না সে একটা সমস্যা, দ্বিতীয়তঃ কোলকাতা হচ্ছে মহানগরী, কি করে সেখানে তাকে একা তিনি প্রাণে ধরে পাঠাবেন।

ছ'মাসের জায়গায় প্রায় ছ' বছর ঘুরে গেল। কলমী শাক ছিঁড়ে, এর ওর বাড়িতে মুড়ি ভেজে, মা জেঠিমা তাকে পড়িয়েছে। কিন্তু বসন্ত একদিন জোর করে মার অনুমতি না নিয়েই নিজের ভাগ্য ফেরাতে কোলকাতায় পালিয়ে এল।

কিন্তু থাকে কোথায়? জুটে গেল এক আড্ডা! ঐ বেকার বোম্বেটেদের আড্ডা। অসহায় সম্বলহীন বেকার একটা ছেলেকে সেদিন যারা পথ দেখিয়েছিল, জুয়া বা পকেটমার বা ঐরকমের কাজকর্মের পয়সা রোজগারের অপরাধটা সেদিন প্রকট হয়ে তাই দেখা দেয়নি বসন্তের কাছে।

মা ভাববেন বলে সে চিঠি লিখে তার হদিশ দিয়েছে, মা-জেঠিমা মাথার দিব্বি দিয়ে তাকে হরিশরণের বাড়িতে উঠতে বলেছে। আর মামারও তখন একটা ফালতু লোকের দরকার ছিল, তাকে আশ্রয় দিতে আটকায়নি। আড্ডা ছেড়ে মামার বাড়ীতে সে তাই স্থান পেয়েছিল।

সে একবার বোধ হয় গোড়ার দিকে মামাকে বলেওছিল, মামা আমার এখনো পৈতে হয়নি, বামুনের ছেলে—

হরিশরণ মামা হাসলেন, বললেন, আরে ছো ছো! একি তুই বাড়ি পেয়েছিস? কোলকাতায় ওসব নেই। নামের টাইটেলেই প্রমাণ যে তুই বামুনের ছেলে, ভদ্রলোকের ছেলে। এখানে আধুনিক কায়দা বুঝলি? ওসব দড়িমড়ি এখানে কেউ গলায় দেয়ও না, মানেও না।

কিন্তু একটা কিছু ত' করতে হবে, বসন্ত নম্রভাবে বলেছিল।

হ্যাঁ, তা ত' হবেই। আমরা একটা কাজকর্ম দেখে শুনে দেব বৈকি! তার আগে পথঘাট, মানুষ জন চেন কোলকাতার, তারপর চাকরী। এ তোদের কুমারশাইল কি তালপুকুর গ্রাম নয় রে!

ধীরে ধীরে বসন্ত কোলকাতা চিনেছে, তার মামাকে চিনেছে। প্রায় বারো বছর ধরে এখানে পড়ে থেকে এর ওর চেষ্টায় আর বাবার আগ্রহের কথা স্মরণ রেখে ম্যাট্রিকটা প্রাইভেটে পাশ করেছে, টিউশনী করে নিজের চেষ্টায় একটা কলেজে হাফ-ফ্রীতে আই-কম্‌ও পাশ করেছে। বি, এতে কোথাও ভর্তি হতে পারেনি। ক'দিন একটা ছোট স্কুলে মাস্টারি পেয়েছিল, এবং সেই চাকরির জোরে প্রাইভেটে বি.এ. পরীক্ষা দেবার মনস্থ করে বেশ কিছুদূর পড়েও ছিল। কিন্তু মৌসুমী ফুলের মতো স্বল্প মাইনের চাকরিটাও খসে গেছে। কষ্টে দুঃখে থেকে একবার বি. এ. পরীক্ষাও দিয়েছিল কিন্তু সুবিধে করতে পারেনি।

ধীরে ধীরে সহরের বৃহত্তর জীবনের একটা ছায়ার যেন সে অনুধাবন করতে পারে। কিন্তু চাকরি তার একটা চাই। এতদিনের চেষ্টায় সামান্য কিছু উপায় সে করে, কিন্তু বাড়িতে মা জেঠিমার হাতে কয়েকটা টাকা পাঠাবার মাসিক ব্যবস্থা কিছুতেই সে করে উঠতে পারে না। বার দুই তিন নিজের দেশে মার কাছে সে গিয়েছিল, কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

বসন্তের জীবনের পটভূমি এইরকম।

বসন্ত যে একেবারে বখে যায়নি তার কারণ সে মনে মনে বাবার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতো। মৃত পিতার একান্ত ইচ্ছাকে এতটুকুও বাস্তব রূপ দেবার জন্যে ভাবতো। তাই লাইব্রেরীতে গিয়ে বই পড়েছে, কষ্ট দুঃখের মধ্যে থেকে, হোটেলে না খেয়েও নিজে দু একটা বই কিনেছে। নিজের অকপট দারিদ্র্যকে সে গোপন করেনি, তবু এরি মধ্যে দু'একটি মেয়ে তার যৌবনের সাহচর্য লাভের চেষ্টা করেছে।

বসন্তের সেখানেই আশ্চর্য লাগে।

তাদের আড্ডার পাণ্ডা যে গজানন—তার ছোট বোনটি যেন বসন্তের প্রতি কেমন একটু ভাব নিয়ে অকারণে বসন্তদা-বসন্তদা করে, হাতে এক খিলি পান দিতে গিয়ে কি এক কাপ চা নিয়ে বসন্তের হাতে হাত ঠেকিয়ে দেয়, সেই স্বল্প স্পর্শ নিয়ে মনে মনে গুণগুণও করে! বসন্ত ঘটনাটি সরলভাবে গজাননকে বলেছিল—গজুদা, রাধি কিন্তু একটু কেমন কেমন বেয়াড়া হয়ে পড়ছে।

অর্থাৎ?—গজানন প্রশ্ন করে।

থতমত খেয়ে যায় বসন্ত। কোনো একটি মেয়ের অন্তরের নিভৃত বাসনার যদি কোনো বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে—তবে তাকে সাধারণ্যে ফাঁস করে দেওয়া বোধ হয় মনুষ্যত্বের দিক থেকে ঠিক নয়। তা ছাড়া, গজানন হয়তো উল্টো ভেবে বসতে পারে যে বসন্ত রাধার প্রতি দুর্বল হয়েছে বলেই বোধ হয়—

বসন্ত বেশ চিন্তা করেই গজাননের কাছে বললে—রাধি যখন তোমার বোন, তখন সে আমারও বোন। কিন্তু তার যেন মাঝে মাঝে ভূত চাপে মাথায়।

গজানন এবার আর অর্থাৎ বলতে পারে না। সে ব্যাপারটি যে জানে না এমন নয়, বরং রাধার জন্যে পাত্র হিসেবে বসন্তকে ধরেই রেখেছে, এমন শিক্ষিত সুপুরুষ ছেলে কি আর গজানন পাবে? তাই সে জিজ্ঞাসা করলে কেন, রাধিকে তোর পছন্দ হয় না?

বসন্ত বিস্মিত হলো, বললে—গজুদা, রাধি যে আমার ছোট বোন।

পর্বটা বেড়ে যেত, অন্ততঃ গজাননের বা তার বাড়ীর সকলের আস্কারা আছে জানা গেল—তখন বসন্ত একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। গজাননের অনুপস্থিতিতে দলের কেউ কেউ বসন্তকে বুঝিয়ে দিলে—তুই শালা বসন্ত, তোকে ব্ল্যাক মেল করার চেষ্টা হচ্ছে।

ব্ল্যাক মেল কথাটা বসন্ত দু একবার শুনেছে, কিন্তু জিনিসটা যে কি—তা সে জানে না। রাধার সংগে একটা কিছু তার যদি

ঘটে যায়, ঘটে যদি না-ও যায়, শুধু রটে যায় যদি, তখন বাধ্য হয়েই তাকে রাধাকে গ্রহণ করতে হবে।

বসন্ত চমকে উঠলো। সেইযে সে গজাননের বাড়ী ছাড়লো, আজো সেদিক আর মাড়ায় না।

*আর একবার একটি মেয়ে তার নিবিড় সান্নিধ্যে, একটা স্নিগ্ধ সোহাগ-বেষ্টনীর মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল। মেয়েটির নাম হাসি। হরিশরণ মামার দূর সম্পর্কের এক ছোট শালী। বাঁশধনিতে গৃহপ্রবেশের সময় হাসি এসে কদিন ছিল। বসন্তের মামিমা রুগ্ন। দিদির সংসার গুছিয়ে দিতেই সে এসেছিল। কাজের মেয়ে হাসি। সংসারের কাজ সেরেও হাতে সময় করে দিদির সংসারের খাট চৌকি, বেঞ্চ, চেয়ার, আলনা-দোলনা সাজিয়ে দিয়েছে, এমন কি দুদিন বসন্তের বিছানাটাও তুলে ঝেড়ে মুছে রোদে দিয়ে পরিষ্কার করে পেতে রেখেছে।

বাবাঃ, আপনি কি নোংরা, এইরকম বিছানায় কি করে পড়ে পড়ে নাক ডাকাতেন। হাসি বেশ একটু মিষ্টি সুরেই জিজ্ঞাসা করলে।

বসন্ত হাসিকে দেখেছে, কথাও যে না বলে তা নয়। তবে খেতে দেবার সময় কি চা করে দেবার সময় সে যেরকম চটুল কথাবার্তা বলে তার কোন জবাব দেয় না বসন্ত। এবং সে এও বুঝেছে যে হাসিও তার সুন্দর মিষ্টি কথার চোখা উত্তর শুনতে চায়। এক আধটা লাগসই জবাব তার ঠোঁটে যে না আসে—তা নয়, কিন্তু শোভনতার বিচারে সে সংযত হয়ে থাকে। শুধু একটু আস্কারার চোখে তাকানো ছাড়া বসন্ত আর কোনো সূত্র সৃষ্টি করেনি হাসির কাছে আসবার।

আজ বিছানাটা তুলে পেতে দিলে হাসি, ঘরটা একটু ধুয়ে মুছেও দিলে। তাই ওই রকম ধমক বা গমকের সুর।

বসন্ত বললে, তোমার কথায় দুটো মারাত্মক ভুল আছে হাসি, শুধরে দেওয়া দরকার। আমি মানুষটা খুব নোংরা নই, আর ঘুমোলে আমার নাকও ডাকেনা।

হাসি ছাড়বার পাত্র নয়,—নোংরা আপনাকে বলিনি। আপনি যে সাধুপুরুষ তা জানি। কিন্তু ঘুমোলে যে আপনার নাক ডাকে না—তা মানিনা। কোন প্রমাণ দিতে পারেন?

বা-রে আমার নাকের খবর আমি জানি না, আর বিশেষ ব্যক্তিরা বুঝি তা জানবে।—সে সোজাসুজি হাসির দিকে তাকিয়ে বললে।

হাসি একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে বললে, নাক ডাকা এমন একটা ব্যাপার যে এ সম্পর্কে নিজের জ্ঞানের কোন বড়াই চলে না। ও জিনিষটি কখন কার ক্রিয়াশীল, তা সে বলতে পারে না, বরং শ্রোতাদের সততার ওপর বিশ্বাস রাখাই ভালো।।

কিন্তু আমি আশ্চর্য হই হাসি, তোমার কথা বলার ধরণ দেখে। এক একবার লোভ হয় তোমাকে রাগিয়ে দিই। দিনরাত বক বক করো, আর আমি মুগ্ধ প্রাণে তোমার বাক্যসুধা পান করি। বসন্ত প্রগল্‌ভ ভাবে কথাগুলি বলে।

হাসি শুধু হেসে দৃশ্যান্তরে চলে যায়।

বসন্তের অসুখ করেছে—ব্রংকো নিউমোনিয়া। হাসি শুশ্রূষার মধ্যে দিয়ে তার অনেকটা কাছে এসেছে। ধীরে ধীরে বসন্ত হাসির কাছে ধরা দিয়েছে, বসন্তের জন্য গোপনে তার এসেছে ভাবনা। নিভৃতে একটু বেশী করে হাসির সঙ্গে গল্প করতে ভালোবাসে বসন্ত, তাই জ্বরের পথ্য মামিমার চেয়ে হাসির হাতে বেশী রুচিকর ঠেকে।

হরিশরণ মামা জ্বর সারতেই বসন্তকে নোটিশ দিলেন—নিজের পায়ে দাঁড়াতে, হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে। হাসির সঙ্গে তার প্রীতির এই সম্পর্কের জন্যে নয়; অপ্রয়োজনে খরচ করা মামার স্বভাববিরুদ্ধ। তার প্রয়োজন সংসারে ফুরিয়ে গেছে, সুতরাং এখন মমতার আবেগ মূঢ়তা মাত্র।

বসন্তও নিজেকে সংযত করে নেবার সুযোগ পেল। এ যেন শাপে বর। হাসির কাছে সে ধরা দিচ্ছিল একটু একটু করে, বয়সে ছোট হলে হবে কি, সম্পর্কে হাসি তার গুরুজন। এখনো সমাজ

সংসার রয়েছে,—বসন্ত একটা সুযোগ খুঁজছিল। খাওয়ার পাট চুকিয়ে দিলে মামার বাড়ি থেকে। অকেজো ঘরটা ছাড়ারও চেষ্টায় রইলো। রাত এগারটায় কি বারোটায় ঘরে ঢোকে। মোমবাতি জ্বেলে বিছানাটা মেলে দেয়। একটা বিড়িতে সুখটান দিতে দিতে শুয়ে পড়ে। পরদিন ভোরে, বাড়িতে চায়ের পাট বসার আগে প্রাতঃকৃত্য সেরে সরে পড়ে।

হাসি যেন ধরতে না পারে। সে কী বুঝেছে বসন্ত ধারণা করতে পারে না বটে, কিন্তু মনে মনে একটু যে ছটফট না করে এমন নয়। কিন্তু একদিন শুনলো হাসিও চলে গেছে,—আর সেই যে গেছে, আর ফেরেনি। মামিমা একটু সুস্থ হলে এবং ঘরদোরের মোটামুটি গোছানোর পালা শেষ হতেই হরিশরণ মামা হাসিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, বয়স্ক-মেয়ে তুমি, এখনো আইবুড়ো, তাছাড়া—

তাছাড়া যে কি তা হাসির শোনার ইচ্ছে ছিল কিন্তু বসন্ত আত্মগোপন করেছে, তার কাছ থেকে জেনে সে আর কিছু জানার কৌতূহলকে প্রশ্রয় দিতে পারল না। যার' জন্য হাসি চুরি করতে চায় সেই তাকে চোর বলে ধরিয়ে দিলে নাকি? বসন্তই কি মামাকে কিছু লাগিয়েছে, না—মামা তার জন্যে বসন্তকে বিদায় দেবার অজুহাত তৈরী করে নিলেন। শুধু সেইটা একবার জানতে বাসনা হয় হাসির। তা যদি হয়, তবে বড় বেদনার ব্যাপার হবে। হাসি ধীরে ধীরে অসহায় ঐ ছেলেটার হৃদয়ের কাছে এসে পড়েছিল, হয়তো এটা একটা আকস্মিক দুর্যোগ! কিন্তু অবশেষে তার জন্য বসন্তকে আশ্রয়হারা হতে হবে, এ বেদনা কোন দিন তার মন থেকে ঘুচবে না। তাই যাবার সময় হাসি বসন্তের উদ্দেশে একটি চিরকুট লিখে গেল। তালাবদ্ধ ঘরের মধ্যে ফেলে দিল ছুঁড়ে।

সেদিন একটু বেশী রাত করেই ফিরেছিল বসন্ত। শনিবারের আড্ডায় গেলে এখনো সে তার সম্বিৎ ঠিক রাখতে পারে না। একটা দুর্বার টান তাকে প্ররোচিত করে বাস্তবকে ভুলতে, একটা সামান্য ছোট্ট গুলির মতো স্বাদু দ্রব্য তাকে উত্তেজিত করে প্রথম,

পরে স্তিমিত করে দেয়। উদ্দাম জোয়ারের শেষে ভাঁটার টানের মতন। এই রকম একটা মন নিয়েই সেদিন সে ফিরেছিল ঘরে। দরজা খুলতে সে চিঠির অস্তিত্ব বুঝতে পারেনি, মোমবাতি জ্বালতেও না। বিছানায় শুয়ে বিড়িতে একটা টান দিতেই হঠাৎ দরজার পাশে ছেঁড়া চটি দুটোর দিকে নজর পড়তেই একটুকরো ভাঁজ করা কাগজ দেখা গেল। জুতো দিয়ে তাকে সে মাড়িয়ে ফেলেছে ঘরে ঢুকে। শুয়ে শুয়ে একবার ভাবলে কে আবার তার ঘরে কিছু লিখে পাঠাবে। কিন্তু রঙীন মনের স্তিমিত চেতনার একটা ক্রিয়া তখনো আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাকে। দিনে জেগে থাকার সময়ও স্বপ্ন দেখার মতো বন্ধ আকাশী ফুলের সৌরভের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েও যায় না—এমন ধারা একটা অবস্থা, কৌতূহলের একটা শক্তি তখনো মনকে জাগাতে পারে, নেশার রঙ শেষ হলে যা হয়! সে উঠে গিয়ে চটির তলা থেকে কাগজ খণ্ডটিকে নিয়ে এল। ভাঁজ খুলে মোমবাতির আলোয় পড়লে—

'সম্বোধনের পাট না হয় থাক। আজ শুধু যাবার সময় 'তুমি' বলে ডাকাব অধিকার দাও।

জানি না, আমার জন্যে এ বাড়ি থেকে তোমার অন্ন উঠেছে কিনা। আমাকে নিয়ে জামাইবাবু তোমাকে তিরস্কার করেছেন কিনা বুঝতে পারছি না। তুমি কেন এমন করে লুকিয়ে পড়লে? তিনি আমাকেও নোটিশ দিয়েছেন এ বাড়ি ছাড়তে। যাবাব দিনেও দেখা হলো না, বোধ হয় এ মাসেই দেখা হয়নি। জীবনে এমন করে কাউকে দেখিনি, কারুর জন্যে ভাবিনি, এমন করে কাউকে নিজেরও মনে হয়নি। অথচ তুমিই আমাকে দূরে ঠেলে দিয়েছ; সেখানেই আমার সবচেয়ে বড় পরাজয়। যার জন্যে চুরি করলাম, সেই আমাকে চোর বলে ধরিয়ে দিলে। আমার জন্যে তোমার যে সব অসুবিধা হলো জামাইবাবুর বোঝার ভুলে, সে জন্যে ক্ষমা চেয়ে তোমাকে ছোট করবো না। আমার অনুরোধ—তুমি নিজের প্রতি কখনো নিষ্ঠুর হয়ো না, নিজেকে একটু যত্ন করতে শিখো।

সময় মতো খেয়ো, সময়ে ঘুমিয়ো, আর যদি সম্ভব হয় সাতদিনেও অন্ততঃ বিছানার চাদরটা তুলে একবার ঝেড়ে নিয়ো। হয়তো, আর দেখা হবে না। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই দেখা হবে না। তোমার ঠিকানাও জানতে চাই না। তাই আমারও দিলাম না। ভেবেছিলাম হয়তো এই দুটো ঠিকানার ঐক্য থাকবে—যাক, তুমি কিন্তু নিজেকে নষ্ট করো না, অন্ততঃ তোমার যে একটু আধটু নেশা আছে তা ছাড়বার চেষ্টা করো।—হাসি।'

শেষাংশটুকু তার মেজাজকে বিষিয়ে দিলে। এত গভীরভাবে ভালই যদি বেসে থাকে হাসি, তাহলে সে তার জীবনের বেদনা-বিস্মরণের ব্যাপারটাকে সহজ করে নিতে পারে নি কেন? কিন্তু এই বিক্ষোভটুকু সাময়িক। হাসির জন্যে ক্রমে বসন্তের মনে একটা দাগ না ধরে পারে না। কিন্তু সে শুধু হতাশার, বেদনার। হাতের কাছে পেয়ে সে কী করে এই অমূল্য রত্ন হারালো?

বসন্তের জীবনে এই হলো নারীর প্রথম বিশিখ। তাই এ বিশিখে স্নিগ্ধতা নেই, জ্বালাই বেশী। এ বিশিখ ফুল দিয়ে তৈরী নয়, হলাহলে গাঁথা।

ধীরে ধীরে যখন এই প্রথম প্রেমের আস্বাদও স্মৃতিলগ্ন হয়ে মরে এল, তখনই বসন্তের সংগে দেখা মালতীর। কতকটা অতর্কিত বটে, কিছুটা নাটকীয়ও। বসন্তের ঠিক যে মালতীকে ভালো লেগে গেল তা নয়। একটা ক্ষতস্থানের সুখকর স্নিগ্ধ প্রলেপের মতো খানিকটা স্বস্তি অনুভব করেছিল মালতীর সংগে কথা বলে, এ কথা বসন্ত অস্বীকার করতে পারে না। হাসি তার মনে আগুন ধরায় নি বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে যেন খানিকটা ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। ঘুণ ধরলে কি উইপোকায় কাটলে ভেতরটা যেমন হয় তেমনই খালি হয়েছিল বসন্তের মন। ঠিক এই সময় এল মালতী। তাই বসন্তকে হয়তো মনে হয়েছিল একটু গায়ে-পড়া, একটু হ্যাংলা। মেয়েদের সম্পর্কে সাত হাত থেকে যে বসন্ত নমস্কার জানাতো,

অন্ততঃ রাধার ঘটনা তাই প্রমাণ করে,—সেই বসন্তের পক্ষে মালতীর সঙ্গে একরকম গায়ে পড়ে আলাপ করার পেছনে হাসির জন্যে এই মমতাটুকু বড় বেশী কাজ করেছিল।

কতটুকু জীবনই বা বসন্তের? তবু এরই মধ্যে কি রকম জটিলতা এসে ঢুকেছে। পাকিস্তানে নিতান্ত রিক্ত অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে আছেন তার মা-জেঠিমা-পিসিমা—তারই মুখের দিকে চেয়ে। এখানে হরিশরণমামা বার বার তাকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর তাগিদ দিচ্ছেন, যাতে সে ঐ অকেজো ছোট্ট ঘরখানা থেকে তার একটা বালিশ, সুজনি আর সতরঞ্চিখানা নিয়ে চলে যেতে পারে। হাসি স্নিগ্ধ একটি পদ্ম ফুটিয়ে তুলেছে তার মনে।

বসন্ত চাকরির চেষ্টায় ঘুরছে। মোদকের আস্বাদে আতুর হয়ে আড্ডায় ছুটছে, আবার হাসির চিঠি নিজের পকেটে নিয়ে দিবাস্বপ্নের আনন্দে ছক কাটছে কল্পনার। তার মাঝখানে আবার এই মালতী। মরুভূমির ধূসরতায় এ আবার কোন্ শ্যামশ্রী!

মালতী ঠিকানা দিয়ে গেছে। একটা টিউশনিও যদি জোগাড় করে দিতে পারে বসন্ত, তবে কার্ড লিখে নির্দিষ্ট একটি স্থানে মালতীকে দেখা করতে বলতে পারে।

টালীগঞ্জে থাকে মালতী। ট্রামে না চেপে বাসে করে কোলকাতার দিকে যাতায়াত করলেই ত' এক-আধ দিন বসন্তর সঙ্গে দেখা হতে পারে। সেও ত' চাকরীর ধান্ধায় ঘুরছে। দশটা পাঁচটায় না হোক্, বারোটা—চারটেয়ত' বসন্ত প্রায় রোজই বাসে দৌড় ঝাঁপ করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—সেই যে বৈশাখের এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায় মালতীর দেখা মিলেছিল, তারপর কত দিন কেটেছে, কত আকাঙ্ক্ষায় মালতীর সন্ধান করে বেড়িয়েছে বসন্তের দুটি চোখ, তবু দেখা মেলে নি। বৈশাখের উত্তপ্ত আবহাওয়া ছাড়া বুঝি মালতী ফোটে না, সৌরভ ছোটে না।

বসন্ত একটি পোষ্টকার্ড লিখে দিল মালতীর ঠিকানায়। ছোট্ট

কয়েকটি কথা ঃ হয়তো স্মরণ নেই, ইন্টারভিউতে আলাপ। একটি টিউশনি জুটিয়েছি। একটি স্কুলের মেয়ে সপ্তাহে চারদিন, মাইনে চল্লিশ। এ ছাড়া আর একটি খবর আছে চাকরির, এক মার্চেন্ট অফিসে।—বসন্ত।

পুনশ্চ দিয়ে বসন্ত ধর্মতলার একটি নির্দিষ্ট ট্রাম স্টপেজে নির্দিষ্ট সময় লিখে দিয়েছিল। তখন দেখা গেল সে সময়ের অনেক আগেই মালতী সেখানে ঘোরাফেরা করছে! বসন্ত এল তার কিছু পরেই।

মালতী বললে, নমস্কার! কতদিন পরে আপনার দেখা পেলাম। বসন্ত একটু হাসলে। বললে, কথাটা বোধহয় আমারই বক্তব্য। তাই না? কতদিন যে আপনার প্রতীক্ষায় বাসে-ট্রামে ঘুরেছি, তার আর ইয়ত্তা নেই। সেই যে ডুব মারলেন—

বারে! ডুব আমি মারলাম—না আপনিই ঠিকানা দেননি নিজের, পাছে চলে যাই—আপনাকে জ্বালাতন করি।

কথাটা ঠিক ও রকম নয় মালতীদি। আমার কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। আমি যে ঘরটায় থাকি, সেখানে একটা গরু কি কুকুরও থাকতে রাজী হয় না। সেই রকম একটা গুদোমে রাতটা পড়ে থাকি, খাই পাইস হোটেলে। চাকরির জন্যে হয় পথে না হয় অফিসের দরজায় ঘুরি। কোথাকার ঠিকানা দেব? তাই আর ও ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করিনি।—বসন্ত যেন মুখস্থ করে এসেছে, এমন ভাবে কথাগুলো বললে।

আমি আবার আপনার দিদি হলাম কবে থেকে? মুখ টিপে একটু হেসে মালতী জিজ্ঞাসা করলে।

একটা কিছুত' বলে ডাকতে হবে। মানে, ইয়ে,—এই সব ঘোরালো সম্বোধনে আমি বড় পটু নই! তা ছাড়া—

মালতী বাধা দিয়ে বললে, তার চেয়ে বরং আপনি আমাকে মালতী বলেই ডাকবেন, আর আপনার খুব অসুবিধা না হলে তুমিই বলবেন।

বসন্ত কোন কথা না বলে মালতীর মুখের দিকে তাকালো।

একটি অপরিচিত মেয়ে, পথেই আলাপ যার সঙ্গে, স্বল্প পরিচয়ের বেষ্টনী ছাড়িয়ে এখনো অন্তরঙ্গ হতে পারলো না, তাকে এত সহজে তুমি সম্বোধন করাটা বোধহয় শোভন হবে না। কিন্তু অযাচিত সেই অধিকার যদি তার কাছে হাজির হয় তাহলে সে তা গ্রহণ করবে না কেন? মালতী তার কাছে এমনি করে ধরা দিতে চাইছে নাকি?

কি ভাবছেন বসন্ত বাবু? মালতী জিজ্ঞাসা করলো।

নারীকণ্ঠে নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনে বসন্তের কেমন যেন একটু রোমাঞ্চ হতে লাগলো। গজানন এণ্ড কোম্পানীতে এবং হরিশরণমামার মুখেই তার নাম সে শুনে থাকে। এই রকম আবেগ-মণ্ডিত স্নিগ্ধ স্বরেও যে তার নাম কখনো উচ্চারিত হবে, আর তা হবে এমনি ভাবে তাকে ডেকে,—এ তার কল্পনার বাইরে ছিল।

একটু উল্লসিত হয়ে বসন্ত বলল, ভাবছি নিজের ত্রুটির কথা। একটা দোষ করে ফেলেছি মালতী। তোমার জন্যে টিউশনির খোঁজ পেয়েছিলাম, কিন্তু এমনই তাড়াতাড়িতে আজ আসতে হয়েছে, ঠিকানাটা নিতে ভুলে গেছি।

এর জন্য এত কুণ্ঠা কেন? আজ এসে ভালই হলো; তবু ত' আর একবার দেখা হলো আপনার সঙ্গে। মাঝে একবার আপনাকে মনে মনে খুব খুঁজেছিলাম। বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু ভাববেন আপনার কথাই বুঝি বলছি, টালীগঞ্জ থেকে যখনই বাসে ট্রামে উঠেছি, একবার সমস্ত বাস ট্রামটা চোখ বুলিয়ে নিয়েছি, যদি আপনার দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু বিধি বাম ছিল। মালতী সহজে কথাগুলি বললে।

কিন্তু কার বিধি? তোমার, না আমার? তুমি আমার দেখা পাওনি তাতে ত' ক্ষতি হয়েছে আমারই, তাই না?

আপনার সঙ্গে দেখা হলে একটা চাকরির খোঁজ দিতে পারতাম। তেমন ভালো চাকরি নয় বলেই হয়তো সেটা আপনার হতে পারতো।

কি চাকরি? এখনো আছে সেটা? বসন্ত উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

বোধহয় না। আমার এক পিস্‌তুতো দাদা খোঁজ এনেছিল। যাদবপুরের দিকে একটা স্কুলে কয়েক মাসের জন্যে একজন মাস্টার চেয়েছিল, সব মিলিয়ে সত্তর কি আশী টাকা দেবে। ভাবলাম, আপনি ত' বেকার বসে আছেন, কয়েক মাস যদি মাস্টারি করেন, খারাপ হতো কী!

খারাপ, তুমি কি বলছো মালতী! একটা দিন যায় ত' পরের দিন চলে না এমন যার অবস্থা, তার পক্ষে এ তো স্বর্গের চাঁদ হাতে পাওয়া।

আমার আত্মীয় এক দাদা ওখানকার সিনিয়র টিচার। ওঁর এক বন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়ায় কয়েক মাসের জন্যে—

বাধা দিয়ে বসন্ত বললে, আচ্ছা, এখন হয় না ওই চাকরিটা?

সে কি আজো খালি আছে? আপনি যদি এ বিষয়ে উৎসাহ বোধ করেন তবে আমি খোঁজ নিতে পারি।—মালতী আন্তরিক ভাবে বললে।

বসন্ত কেমন কুণ্ঠিত হয়ে পড়লো। মালতী তার জন্য সত্যিই চাকরির একটা সন্ধান দিতে পেরেছে, আর সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কপট অভিনয় করে একখানি চিঠি লিখে মালতীর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করার উদ্দেশ্যে ডাকিয়ে এনেছে। মিথ্যা আচরণের সঙ্কোচ বসন্তকে কোনদিন পীড়া দেয়নি, আজ সে নিজেকে বড় ছোট মনে করল।

একটা বীভৎস হাসি বসন্তের মুখে ছড়িয়ে পড়তে চাইছিল, কিন্তু সেটা নিতান্তই অশোভন হবে ভেবে সে একটা বিড়ি বার করে মালতীর অনুমতি ভিক্ষা করলে, যদি অনুমতি দাও ত' একটা ধূমপান করি।

আপনি বুঝি খুব বিড়ি খান? মালতী প্রশ্ন করলে।

খুব নয়।—না, তাই বা কেন, খুবও বলতে পারো। সময় সময় বেশীই খাই। নির্বিকারভাবে সে জবাব দিলে।

বিড়ি খান কেন? সিগারেট ত খেতে পারেন?

পারি না যে—তা নয়। তবে কি জানো মালতী, যারা বিড়ি-খোর, তাদের সিগারেটে শানায় না. খাকির মতো নেশা জমে না। খাকি বুঝলে ত? খাকি হচ্ছে বিড়ির আদুরে নাম। তাছাড়া আর একটা কারণ আছে? বোধ হয় সহজেই তা অনুমান করতে পারো।

ঘনায়মান সন্ধ্যায় গড়ের মাঠে দুজনে বসে বসে কথা বলছিল। কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি, দূরে পথে পথে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে কিন্তু মাঠে বেশ অন্ধকার। একে অন্যের মুখ দেখতে পাচ্ছে না, তবু কণ্ঠস্বরের উত্তাপ এবং আবেগে পরস্পারের হৃদয়েরও খানিকটা অংশ বুঝি উপলব্ধি করতে পারে। ভাষা দিয়ে একের অন্তর অন্যে স্পর্শ করতে চেষ্টা করছে।

থামলেন কেন? আর একটা কারণ কি বললেন না তো? মালতী সুস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে।

তোমার বোঝা উচিত ছিল মালতী। রিক্ত বেকার একটি যুবক—অন্ততঃ মেয়েদের সামনেও সিগারেট ধরাতে পাচ্ছে না। নেশায় নাড়ি ঝুলছে দেখেই না সঙ্কোচ লজ্জা ভাসিয়ে দিয়ে বিড়ি ধরিয়েছি।

মালতীর মুখে বেদনার একটা কালো পোঁচ যেন কে বুলিয়ে দিলে, কিন্তু অন্ধকারে তা বোঝা গেল না।

একটু পরে সে বললে, আমি কিন্তু কালই যাচ্ছি দাদার ওখানে: আপনার মাস্টারিটার খোঁজে। ওখানে না হয় অন্য কোথাও, একটা কিছু আপনার জুটবেই, দেখবেন। কাল আশা করি এমনি সময়ে এখানে দেখা হচ্ছে তখন খবর পাবেন। আর 'আপনিও নিশ্চয়ই সেই টিউশনির ঠিকানাটা আনবেন।

বসন্ত বললে, কাল সন্ধ্যার দিকে? আসতে পারব কি? ঠিক মনে পড়ছে না কাজ আছে কিনা? আচ্ছা তুমি এসো, দেখা হবে।

আজ আর চা পান নয়, দুজনে মাঠে বসে দু'পয়সার চিনে বাদাম ঝাল নুন মিশিয়ে খাচ্ছিল। বাতাসে খরবেগ নেই; তবু সহরের এই চত্বরটি যেন বিশুদ্ধ বায়ুর একটা ডিপো। এটা না থাকলে সহরে মানুষ বুঝি হাঁপিয়ে মরে যেত।

মালতীর সামনে মুখোমুখি বসে হাসি ঠাট্টা করতে করতে বসন্তের মনে হয়—কোলকাতা সহর বড় আজব জায়গা, আর প্রেম বড় বিচিত্র অনুভূতি। মাত্র দুটো দিন দেখা হয়েছে মালতীর সঙ্গে, অথচ এরই মধ্যে মালতীর জন্যে তার মন কাতর হচ্ছে, মালতীকে কেন্দ্র করে ভাবনার একটা পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। মালতীর জীবনের ঘটনা জানতে কৌতূহল হচ্ছে, অন্ততঃ মালতীর জীবনের পটভূমির একটা দিকের পরিচয় পাবার জন্য তার মনে কেমন একটা ব্যাকুলতা জাগছে। কিন্তু মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচ লাগে।

পরদিন বসন্তই আগে এসে বসেছে। সন্ধ্যা তখনো হয় নি; সূর্য্য সবে পাটে বসেছে। সমস্ত দিনের উন্মত্ত রুদ্রতা ছড়াতে ছড়াতে একটু ক্লান্তভাবে পশ্চিমের পথে শেষ সঞ্চরণে পা বাড়িয়েছে। পাখিদের ডানায় বিকেলের আলোর সোনালি ছোপ প্রতিফলিত হয়েছে। গড়ের মাঠের গাছে গাছে পড়ন্ত রোদের উদ্ভাস যেন শহুরে রুক্ষ প্রকৃতিকে শ্যামলতা মাখিয়ে দিয়েছে। আকাশ নির্মেঘ নীল, আসন্ন সন্ধ্যায় তার তামাটে রঙ মুছে যাচ্ছে। মাঠে বসে বসন্ত চারিদিকে চেয়ে দেখলে—এমন উন্মুক্ত, উদার প্রসন্ন বিকেল বোধহয় সে আর কখনো উপলব্ধি করেনি, অন্ততঃ এই সহরে। দুঃখ ভুলতে সে মোদক খায়, দৈনন্দিন জীবন গুজরানের জন্যে মিথ্যার বেসাতি করে, দুটো পয়সা রোজগারের জন্য কখনো সখনো তাসের জুয়ায় বসে। কোনওদিন প্রকৃতির এই উদার আশীর্বাদ তার ক্লান্ত মনে স্নেহের হাত বুলিয়ে দেয় নি। কখনো এই ফাঁকা মাঠ, এই মনোরম বাতাস, সোনার রোদ, উন্মুক্ত নীলাকাশ, পাখির কাকলি; গাছে গাছে পাতার বাজনা—তাকে এমন মদির করে তোলে নি। মালতীর জন্যে প্রতীক্ষার ব্যাপারেই সে এদের সাক্ষাৎ সখ্য লাভ করলো। মালতীর প্রতি প্রসন্নতায়, কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে গেল।

কিন্তু মালতীর কাছে সে যে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছে তাতে যেন সে নিজের কাছে ছোট হয়ে গেছে। এর আগে সে ত' কতই মিথ্যা

আচরণ করেছে, কিন্তু কোথাও তার বিবেক তাকে এমন করে দগ্ধ করে নি। এমন কি হাসিকেও যে সে দু' একটি মিথ্যা কথা বলতো, তাতেও তার এমন জ্বালা ধরতো না। কিন্তু মালতী কি যাদু জানে?

আজ মালতী একটু দেরী করেই এল। বসন্ত বললে, প্রতিশোধ নিলে বুঝি? কালকে আমার আসতে একটু দেরী হয়েছিল, তাই কি ইচ্ছে করেই—

না, না, মালতী বলে, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমি আপনার কাজের জন্য যাদবপুর গিয়েছিলাম, সেখান থেকে, আসতেই দেরী হয়ে গেল। দাদা বাসায় ছিল না। তার জন্যে বসে বসে যখন হতাশ হয়ে উঠছি, তখন সে এল।

কি হলো? কোন খোঁজ পাওয়া গেল?

বলছি। আগে বসি ত' জাঁকিয়ে। আর আজকে কিছু কাজুবাদাম নিয়ে এসেছি। কাল লক্ষ্য করেছি, আপনি বাদাম খেতে খুব ভালবাসেন—মালতী তার মুখের দিকে চেয়ে বললে।

শুধু বাদাম কেন মালতী, যে কোন খাবার খেতে আমি ভালবাসি। কাল সারাদিন অভুক্ত ছিলাম, সন্ধ্যে বেলার বাদাম আমার প্রাতরাশের কাজে লাগলোও বলতে পারো, অর্থাৎ ওই বাদাম দিয়েই ব্রেকফাষ্ট করেছিলাম কাল। নির্বিকারভাবে সে কথা কটি বললে।

শুনে মালতী একেবারে থ' হয়ে গেল। ভাবল, কাল সারাদিন যে অভুক্ত ছিল, তার মুখে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি বা দুঃখের চিহ্ন ফুটে ওঠেনি। কেন উপোস করেছিলেন? হোটেলের পয়সা ছিল না? না, আরো কিছু? আর কি হতে পারে? সংসার নেই যে একজনের ওপর রাগ করে পৌরুষ দেখাবার জন্যে বাঙালীর ছেলে হিসেবে উনি অন্নজল ত্যাগ করেছেন। দারিদ্র্যই বোধহয় হোটেলে যাওয়ার ব্যাপারে বাদ সেধেছে। কিন্তু সে কথা ত' যেচে জিজ্ঞাসা করা যায় না, বিশেষ করে কালকে যখন বিড়ি খাওয়ার ব্যাপারে মালতী তার মনে একটু দুঃখ দিয়ে ফেলেছে। তাছাড়া

আলাপটা এমন নিবিড়তম হয়নি, যাতে বসন্তবাবুর হাঁড়ির খবর পর্যন্ত সে রাখতে পারে। অনূঢ়া একটি মেয়ের পক্ষে অল্প পরিচিত এক যুবকের সম্পর্কে এই জাতীয় কৌতূহল কিন্তু আদৌ সংগত বা শোভন নয় ; সে কথা মালতী জানে। তবু মনটা উতলা হলে, তাকে ত' আর ঠেকানো যায় না।

মনে নানা চিন্তা করে মালতী বেশ সহজভাবেই প্রশ্ন করলে, আপনি ত' হোটেলেই খান, এই রকমই না বলেছিলেন ?

হ্যাঁ, বসন্ত নির্লিপ্তভাবে সংক্ষিপ্ত জবাবটুকু দিলে।

কি জানি হয়তো বসন্তবাবু পছন্দ করছেন না এই প্রসঙ্গ, তাই মালতী আর সে পথ মাড়ালো না। পাশ কাটিয়ে বললে, যাদবপুরে দাদার সঙ্গে অবশেষে দেখা হলো, আর একটা খোঁজ পাওয়া গেল। তবে দাদাদের স্কুলে সে চাকরিটা খালি নেই। আজকালকার বাজারে কি আর কোথাও চাকরি খালি পড়ে থাকে।

তবে খোঁজটা কোথায় পাওয়া গেল ? বসন্ত একটু বাঁকাভাবেই প্রশ্ন করলে।

মালতী জবাব দিলে, দাদাদের স্কুলের কাছেই একটা জুনিয়ার হাইস্কুল হয়েছে। এখনো বোর্ডের অনুমতি পায়নি ; সেখানে প্রায়ই মাস্টার দরকার হয়। যদি রাজি থাকেন, সেখানে একটা মাস্টারি জুটতে পারে। রাজি আছেন ?

ক্ষতি কি ? পাশাখেলা জানো ? বসন্ত প্রশ্ন করলে।

আপনার হেঁয়ালি ঠিক বুঝলাম না। মাস্টারির সঙ্গে পাশাখেলার আবার সম্পর্ক কি ? মালতী ঠোঁট উল্টে এমন একটা ভঙ্গীতে প্রশ্ন করলে, যাতে আর তাকে তরুণী বলে মনে হলো না, যেন এক পাকা গিন্নী কোন বিষয়ে গভীর অবিশ্বাস প্রকাশ করছে।

পাশাখেলার একটা প্রধান ঘটনা হচ্ছে হাত খোলা, অর্থাৎ প্রথমে ছয় আর তিন—নয় অথবা ষোলো সতেরো ফেলে হাত খুলতে হবে, তারপর যাই খেল না কেন দান পাবে। বেকার দশা ঘোচাতে আগে হাতটা খুলি, তারপর যা হোক একটা জুটবেই। বুঝলে ?

লঘু আর চপলভাবে মাথা নেড়ে মালতী বললে, জী হুজুর।

এই মুহূর্তে মালতীকে বর্ষীয়সী নারীর মতো মনে হলো, আবার পরক্ষণেই সে ষোড়শী, চঞ্চল হরিণীর মতো হাল্কা আর ক্ষিপ্র। বসন্ত বিস্ময় বোধ করতে থাকে। কথায় নিরাসক্ত ভাব ফুটিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, মাইনে পত্তরের কথা কিছু শুনলে নাকি?

মাইনে কত মালতী জানতো, কিন্তু প্রকাশ্যে তা উল্লেখ করা চলে না। নতুন স্কুল, সবে হয়েছে। ত্যাগের আদর্শ নিয়ে শিক্ষকদের এখানে আসতে আহ্বান করা হচ্ছে। তাই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ত্যাগী মাস্টাররাই আসেন এবং ত্যাগ করতে করতে যখন আর তাঁদের কিছুই করণীয় থাকে না, তখনই তাঁরা চলে যান। সেজন্য প্রায়ই সেখানে নতুন নতুন ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন ঘটে।

বসন্ত নাছোড়বান্দার মতো তবু প্রশ্ন করলো, আমি লজ্জা পাবো না, তুমি নির্ভয়ে বলতে পারো, কত টাকা আন্দাজ পাওয়া যাবে।

মালতী সত্যিই লজ্জা পেয়েছিল। গ্রাজুয়েট টিচারদের মাইনে ধরা হয়েছে পঞ্চাশ টাকা আর আণ্ডার গ্রাজুয়েটদের বেলায় তিরিশ। কোন কোন ক্ষেত্রে চল্লিশ। তবে স্কুল যদি দাঁড়িয়ে যায়, কাউকে বঞ্চিত করা হবে না।

তুমি দেখো আমার জন্যে, কিন্তু তুমি বোধ হয় জানো না আমি একজন আণ্ডারগ্রাজুয়েট।

মালতী একটু পাশ কাটানো ধরনের উত্তর দিলে, আমি খুব চেষ্টা করবো আপনার জন্যে। হয়তো শীগগির একটা কিছু হতেও পারে। দাদা সে রকম আশ্বাস দিয়েছে। বলেছে, তোর পরিচিত লোক যখন, তখন ত' চেষ্টা করতেই হবে। দাদা এ রকম প্রতিশ্রুতি বড় একটা কাউকে দেয় না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। মালতী ব্যাগ থেকে ছোট এক ঠোঙা কাজু বাদাম বের করে বললে, মাঠে আড্ডা দেবার সময় এ রকম প্রিয় বন্ধু বোধহয় আর নেই।

তা কেন আমার ত' মনে হয় কাজুর চেয়ে বেশী মিস্টি তুমি নিজে, বসন্তের গলার সুরে কোন ওঠানামা ছিল না। প্রেম নিবেদনের একটা আবেগময় বা উচ্ছ্বসিত বিলাস ছিল না। তবু মালতী আরক্তিম হয়ে গেল। নিজে হাতে করে বসন্তের হাতে কয়েকটি বাদাম গুঁজে দিতে যাচ্ছিল, তা আর পারলে না, লজ্জায় একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল। কুমারসম্ভব কাহিনীর নায়িকার মতো সুশ্রী এবং প্রিয়দর্শনা সে নয়, নইলে তারও বোধহয় 'ন যযৌ ন তস্থৌ'-এর মত অবস্থা বলে বর্ণনা করা চলতো।

লজ্জার এই ধাক্কাটা সামলে নিয়ে মালতী বললে, একটু স্বার্থপরের মত জিজ্ঞাসা করছি, আমার সেই টিউশনিটার খোঁজখবর কিছু পেলেন নাকি? অন্ততঃ ঠিকানাটা? কোথায় কার কাছে গিয়ে ধর্ণা দিতে হবে?

বসন্ত একটু ইতস্ততঃ না করে চটপট জবাব দিলে, এজন্যে এত উতলা কেন? মাস্টারি যদি আমাকে করতেই হয়, তাহলে তোমারও মাস্টারি করা চলবে না মালতী। মাস্টারি জিনিষটা এমন কিছু আরামের নয় যে আমরা উভয়েই এই গোলামিতে বিকিয়ে যাবো। তাই ইচ্ছে করেই তোমার ওই টিউশনির খোঁজ আনিনি। খুব চেষ্টা করছি, তোমাকে কোন একটা অফিসে ঢুকিয়ে দেবার।

মালতী হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পেলে না। সামান্য একটা তিরিশ টাকা মাইনের মাস্টারির জন্যে মালতীকে যে সুপারিশ ধরে, তার পক্ষে মালতীর একটা চাকরী জুটিয়ে দেওয়ার আস্ফালন দেখানো বা আশ্বাস দেওয়া একটু হাস্যকর ঠেকে। তবু বসন্তের আন্তরিক ইচ্ছাটুকু উপলব্ধি করে মালতী দুঃখ পায়।

মালতীর সংসার ছোট। মা নেই, বাবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী। বাঁ দিকটা একেবারে ধরে গেছে। এখন ওঠা হাঁটা বন্ধ; বিছানাতেই সর্বদা পড়ে থাকেন। রাস্তার ধারের একফালি একটা দোকান ঘরে কিছু স্টেশনারী জিনিস আর নিত্যপ্রয়োজনীয় আরো কি কি টুকিটাকি জিনিস নিয়ে বসতেন রাস্তায় টুল পেতে। দু' পাঁচ টাকা লাভ যে

হতো না তা নয়, কিন্তু বয়সের সঙ্গে রক্তের চাপ বাড়লো—এখন বাঁ দিক পড়ে গেছে। দোকান ছাড়তে হয়েছে, ঘরে একেবারে নিষ্কর্ম্মা বসে থাকতে হচ্ছে। মালতীর আর একটি ছোট বোন আছে—ভারতী। স্কুলের নীচু ক্লাসে পড়ে, আর সেলাই শেখে। যদি কখনো দিন আসে তবে মাসিক বন্দোবস্ত করে একটা সেলাইকল কিনে ঘরে বসে সূচীশিল্পের মাধ্যমে দুটো পয়সা উপায় করবে। আর মালতী নিজে কোন রকমে এস্, এফ্, পাশ করেছে। চাকরির চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার ওপরেই প্রধান দায়িত্ব সংসার চালাবার। বুড়ো বাবার চিকিৎসা, ছোট বোনের লেখাপড়া—সবই মালতীর ঘাড়ে। বাড়ি ভাড়া দিতে হয় যৎসামান্য কুড়ি টাকার মতো। কিন্তু চাকরী যার নেই, তার পক্ষে ওই কুড়ি টাকাও কম নয়। তাই মাস্টারির যন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকার বিলাসবোধ অন্ততঃ মালতীর নেই। কিন্তু সব কথা ত' বসন্তবাবুকে খোলাখুলি বলা যায় না।

দুটো জীবনের মধ্যে মিল আছে কোথাও, তাই এত তাড়াতাড়ি একে অন্যের কাছে আসতে পেরেছে। ধীরে ধীরে পরস্পরের জীবনের পরিচয়ও তারা পায়, দুঃখের খবর জেনে বেদনা বোধ করে।

বসন্ত আর মালতীর আলাপ আরো একটু গভীর হয়। মালতীর বাড়িতে গিয়ে বসন্ত ভারতীর সংগে আলাপ করে আসে, ওদের রুগ্ন বাপের সংগে দুদণ্ড বসে কথা বলে, সান্ত্বনার সুরে আলোচনা করে।

মালতীর বাবার নাম জয়নারায়ণ মিত্র। এককালে বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের লোক ছিল, কিছু জমি জায়গা ছিল, দুচার টাকা বাড়তি আয়ও ছিল, বাবুয়ানায় অবশ্য তার বেশী ব্যয়ও হতো। ধীরে ধীরে পাত্রের জল এল ফুরিয়ে। রুগ্না স্ত্রী আর সংগে দুটি মেয়ে নিয়ে কলকাতায় চলে আসতে হলো, জ্ঞাতিদের সংগে বিবাদ বিসংবাদ করার পর। সরকারী চাকরি করার মত বয়স নেই, অন্য চাকরি করার মনোবৃত্তি নেই। কিছুদিন জমানো টাকায় চললো, আরও কিছুদিন রুগ্ন স্ত্রীর গায়ের গহনা বেচে কাটলো। তার পর রুক্ষ এক অভাবের

রাক্ষস সংসারে স্থায়ী বাসা বাঁধলো। ভারতী ও মালতীর পড়াশুনো বন্ধ হলো। বাবা বললে, বাড়িতে পড় ; মেয়েদের প্রাইভেট পরীক্ষা দেবার যখন ভালো ব্যবস্থা রয়েছে, তখন মিছিমিছি স্কুলে অত টাকা ঢালার কোনো মানেই হয় না, আর যখন আমাদের অবস্থা পড়ে এসেছে।

মালতীর মার অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগলো। চোখে মুখে একটা মৃত্যু বিধুরতা যুটে উঠেছে। জয়নারায়ণ মানসম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে কয়েকটি টাকা সংগ্রহ করে ছোট্ট একটা পাঁউরুটির দোকান দিলে, অন্য জিনিসের একটা দোকানের গায়ে একটু জায়গা করে। সেখানেই ক্রমে ক্রমে স্টেশনারী দোকান হলো। জয়নারায়ণের হাজাব চেষ্টা আর ইচ্ছা সত্বেও মালতীব মাকে ধরে রাখা গেল না। সংসারেব অবস্থা একটু স্বচ্ছল হতেই তিনি ইহলোক ত্যাগ কবলেন।

কিছুদিন ঔদাসীন্যে কাটলো জয়নারায়ণের, তারপর অবশ্য রক্তের চাপ, মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া, বাম অংগ একেবারে নিঃসাড় হয়ে অকেজো হওয়া। ইতিমধ্যে মালতী স্কুলফাইন্যাল একবারেই পাশ করে গেল। ভারতীও ঘরকন্নার কাজ, রান্নাবান্নাব কাজ শিখে ঘরের কর্ত্রী হয়ে বাবাব সেবায় আত্মনিয়োগ করতে শিখলো।

মালতী ও ভারতীর বিয়ের জন্য, জয়নারায়ণ ব্যস্ত হবার আগেই পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়লো।

দোকানটি উঠে গেল, দোকানেব জিনিষপত্র বেচে ক'দিন চললো। পাড়ার দু একটা ছোট ছেলেমেয়েকে পড়াবার দায়িত্ব নিলে মালতী। কেউ দুচার টাকা দেয়, কেউ দিতে পারে না; কেউ—মালতীর ভবিষ্যৎ সুখেব হোক বলে আশীর্বাদ করে তাব ছোট বাচ্চাকে বিনা বেতনে পড়িয়ে নেয়। কষ্ট যে অনুপাত করতে হয়, সেই হারে অর্থ আসে না।

ভারতী এ বাড়ী সে বাড়ী থেকে পুরনো খবরের কাগজ চেয়ে আনলে, ঠোঙা তৈরী করে দোকানে দোকানে দিয়ে বিক্রী করে

এল। জীবন সংগ্রামের এই প্রক্রিয়া দেখে জয়নারায়ণ মেয়েদের লুকিয়ে শুধু ডান চোখ দিয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলো।

মাঝে মাঝে মালতী যখন বাবার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত, জয়নারায়ণ কতবার ডান হাতখানা মালতীর মাথায় রেখে বলেছে—তোদের দুটির জন্যে যে আমি মরতে পারছি না মা। কি ভেবেছিলাম আর কি হয়ে গেল। জয়নারায়ণ মিত্তিরের মেয়ে আজ পথে বেরিয়েছে, দুটো পয়সা রোজগারের জন্যে। আমার দম্ভের মুখে খুব উপযুক্ত রকমেই ছাই পড়েছে।

মালতী ধমক দেয়, তুমি চুপ করো ত' বাবা।

কোন দিন বা বসন্তের সংগেও জয়নারায়ণের কথা হয়। মেয়ে দুটোর হিল্লে না হওয়া অবধি রুগ্ন দেহটাকে বহন করে চলতে হচ্ছে। এ বিড়ম্বনা সহ্য করা যে কত কষ্টকর, তা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেউ বোঝে না। বসন্ত কি সহজে বুঝবে ?

জয়নারায়ণ বলে—বাঁ অঙ্গটা পড়ে গেছে একেবারে। বাঁ চোখে দেখতে পাইনা, বাঁ হাত বাঁ পা চলে না, জিভের বাঁ দিকটাও অসাড় দেখো না বাবা—কথা তাই জড়িয়ে যায়, বেঁকে যায়, তবু মেয়ে দুটোর মুখের দিকে চেয়ে যমরাজার কাছে আবেদন পাঠাই—আর একটু সবুর করুন, মেয়ে দুটোর গতি না হলে—

একটু দম নিয়ে জয়নারায়ণ বলে চলে—তা বাবা বসন্ত, তুমিই না হয়—মালতীর জন্যে একটা ছেলেটেলে দেখো। তোমাদের বন্ধু-বান্ধব ত' কত আছে। তবু একটার বিয়ে দিয়ে যেতে পারলেও বুঝবো—ছোটটা তবু বোন ভগ্নীপতির কাছে একটা আশ্রয় পাবে।

বসন্ত একটু দুঃখবোধ যে করে না এই পরিবারের জন্যে এমন নয়। ধীরে ধীরে সে মালতীর কাছে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। কয়েক দিন দেখা না হলে শুধু খারাপ লাগে না, সমস্ত মন প্রাণ ব্যাপ্ত করে মালতীর জন্যে ব্যাকুলতা জাগে। অথচ এই মালতীকে সে মিথ্যা কথা বলে, কপট আচরণের আসবে জাগিয়ে রাখে।

আশ্চর্য! চাকরির সন্ধান সে না করেই বলে, বোধহয় আগামী মাস থেকে তোমায় একটা কাজে জুড়ে দিতে পারবো।

মালতী আশা করে, আবার আশা-ভংগের বেদনায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, ভাবে চাকরির বাজার বুঝি এই রকম। মুখ ফুটে শুধু বলে, সত্যি এবার আপনার কথায় কি জানি কেন বড় বেশী আশা করে-ছিলাম। আর যে পারি না বসন্তবাবু—

মালতীর কণ্ঠে একি সুর? এতদূর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে সে বসন্তের ওপর? কিন্তু বসন্ত বেশ ভাল করেই ভাবে, এই অযোগ্য নেশাভাঙ করা দরিদ্র একটা বখাটে ছোকরার ওপর একি বিশ্বাস! এইভাবে বসন্তের সমস্ত কথা সমস্ত ব্যবহার যদি মালতী নিতান্ত আন্তরিক বলে গ্রহণ করে, তবে ত' আশাভংগের দুঃখ মালতীর বুকে যতটা বাজবে, তার চেয়ে ঢের বেশী বাজবে বসন্তের নিজের। এ রকম প্রত্যাশার জন্যে মালতীর প্রতি সহানুভূতিতে তার বুক ভরে যায়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, চাকরি সে একটা করে দেবেই মালতীর, যেমন করে হোক।

যাদবপুর ইস্কুলের সে কাজটা অবশ্য মালতী করে দিতে পারেনি বসন্তকে। কিন্তু তার একটা উপকার সে করেছে। দূর সম্পর্কের আত্মীয় এক দাদার কাছে থেকে বই পত্তর জোগাড় করে, আরো নানারকম সাহায্যের ব্যবস্থা করে বসন্তকে বি, এ পাশ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে; আর বসন্তও মালতীর দিকে চেয়ে বাইরের ছাত্র হিসেবে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে গেছে।

মালতী মাঝে মাঝে তাগাদা করে, কি হলো বসন্তদা, চাকরির পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে?

শুধু চাকরী? অর্দ্ধেক রাজত্ব সহ রাজকুমারের ব্যবস্থা করছি, দাঁড়াও না একটু। কাকাবাবু ত' আমার ওপর ভার দিয়েছেন—

বসন্ত-মালতীর সম্পর্ক নিবিড়তর হয়েছে। পরস্পরকে ওরা কাছে টানে, একটু যদি ছোঁয়া লাগে হাতের, একটু যদি হৃদয় বিনিময়ের

কথা হয় তাই নিয়ে উভয়ের মনে মনে ফাল্গুনী রচনার কাজ চলে। বসন্তকে জয়নারায়ণ স্বীকার করে নিয়েছে, মেয়ে দুটির একজন অভিভাবক দরকার, এই ভেবে। তা ছাড়া—

তা ছাড়া তার শরীরের যা অবস্থা, হুট করে যদি একটা কিছু হয় তার, তবু মালতীর একটা গতি হবে। যদি রক্ষক হিসাবে এসে বসন্ত ভক্ষকের ভূমিকা নেয়, ক্ষতি কি; ভারতীকে কিন্তু মালতী কোন অবস্থাতেই ফেলতে পারবে না। জয়নারায়ণ মিত্র তাই বার-বার তার মাথায় হাত রেখে আড়ষ্ট জিভে স্পষ্ট কথা জানাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে আশীর্বাদ করেছে,—তোমার কল্যাণ হোক বসন্ত, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক, বাবা।

বসন্ত একদিন মালতীকে জিজ্ঞাসা করলে, কি জানি, কাকাবাবু কি বলতে চান বুঝি না। আমার মনের ইচ্ছা ত' আমি কোনদিন ব্যক্ত করিনি অথচ প্রায়ই তিনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক জানাবার প্রার্থনা করেন।

আমিই তোমার মনের খবর পেলাম না, তা আমার বাবা! মালতী ঠোঁট উল্টে বললে।

কি খবর তুমি জানতে চাও বলো? বসন্ত ব্যাকুল দুটি চোখ তুলে প্রশ্ন করে।

কি খবর আবার? পাশ কাটানো উত্তর দেয় মালতী।

সত্যি, প্রথম প্রথম তোমার সঙ্গে ব্যবহারে কোন বেদনা ছিল না, যত দিন যাচ্ছে—যত নিবিড়ভাবে মিশছি, ততই যেন তোমাকে হারাবার বেদনা আমাকে পেয়ে বসেছে।—বসন্ত বললে।

তোমার কি হলো আজ বলো ত'? মালতী স্নিগ্ধ ভাবে প্রশ্ন করলে।

পর যে কি করে আপনার চেয়েও আপন জন হয়, তা তোমরা বুঝিয়ে দিয়েছ! কিন্তু কি জানো মালতী—বসন্ত হঠাৎ থেমে যায়, কথা শেষ করতে পারে না। মালতী চোখ তুলে তাকায় তার দিকে, বসন্ত আর কিছু বলতে পারে না।

হুজনে আজো বের হয়—চাকরী খোঁজার অছিলায়, কিম্বা এটা সেটা কেনাকাটার ছুতো নিয়ে। বসন্ত মুগ্ধ হয় মালতীর চোখের দিকে চেয়ে, মালতী বসন্তের মুখ দেখে নিজের জীবনের দুঃখ কষ্ট বিপর্যয়কে গ্রাহ্য করে না। শুধু বসন্তের মনে জ্বালা ধরে—মালতীর সংগে তার ব্যবহারটা আরো অকপট হলে সে যেন শান্তি পেত।

গড়ের মাঠে বসে আছে দু'জনে, হঠাৎ বৃষ্টি এল। সন্ধ্যে উৎরে গেছে—অন্ধকারে এরই মধ্যে অকালবর্ষণের এক সাংঘাতিক আয়োজন ঘটে তাদের অজান্তে এমন মর্মান্তিকভাবে,—তা তারা দু'জনে ঘুণাক্ষরেও বোঝে নি। ফাঁকা মাঠের এই অকৃপণ প্রচণ্ড বৃষ্টি,—ধরণী হয়তো ঠাণ্ডা হলো, আবহাওয়া-লক্ষ্মী হয়তো সহরবাসীর উষ্ণ মেজাজে সিক্ত কমণ্ডলুর স্পর্শ ঠেকালেন,—হয়তো এ বর্ষণ অভিনন্দনযোগ্য, কিম্বা বসন্ত-মালতীর পক্ষে এ বৃষ্টির অর্থবহ কোনো ইঙ্গিত আছে। দুজনে দৌড়ে একটা বড় গাছের তলায় আশ্রয় নিলে। কিন্তু কতক্ষণ! পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যেই টপটপ করে জল পড়তে সুরু হলো। সেখানেও—গাছের পাতায় সঞ্চিত যে ধুলো—তাই ধুয়ে মোটা মোটা ফোঁটায় জল পড়তে লাগলো। কাপড়ে জামায় পড়ে যে দাগ হচ্ছে—তা খেয়াল নেই কারুরই। শুধু সেই অবিরাম প্রচণ্ড ধারাপতনের শব্দ—সচকিত পাখিপাখালির করুণ চীৎকারে—মাঝে মাঝে ঝড়ের দমকা হাওয়ার নিঃশ্বাসে, বিদ্যুতে, বর্ষণে মালতীর বেশ লাগছিল।

বসন্ত বললে—তোমার হয়তো ঠাণ্ডা লাগবে মালতী।

কিন্তু বেশ লাগছে—না? এই রকম এক ফাঁকা জায়গায় আকাশের এই মাতামাতি দেখতে আমার ভারি ভালো লাগছে। আর, মালতী গলার সুরটা একটু নামিয়ে বললে—তাছাড়া সংগে তুমি রয়েছো!

বসন্ত উপলব্ধি করলে কথা কটি, কিন্তু নিজেকে সংযত রেখে মুরুব্বিয়ানার চালে বললে—তুমি কবিত্ব করতে পারো, কিন্তু বৃষ্টি চট করে থামবে বলে মনে হয় না, শহর এরই মধ্যে ভেসে গেছে, গোটা

শহর না হোক, শহরতলির কিছু কিছু জায়গা ডুবে গেছে—টালীগঞ্জ আর ফেরা যাবে না; রেলপোলের তলায় একগলা জল দাঁড়িয়ে গেছে ইতিমধ্যে। হয়তো এই গাছের নীচে সিক্ত বসনে তিক্ত অন্তরে রাতটা না কাটাতে হয়—বসন্ত এই ভয়ের কথাটা বেশ আভিনয়িক চালে ঘোষণা করে দিলে।

আমি ত' বলেছি—তুমি যখন কাছে রয়েছ—আমার ভয় করছে না। একটা রাত—এই ফাঁকা আকাশের তলায়, এই গাছের আশ্রয়ে এমন দুর্যোগের মধ্যে না হয় কাটালাম। তবু ত' চিরদিন মনে থাকবে—অন্ততঃ এই রাতটার কথা। মালতীর কণ্ঠে বেদনাতীত কিসের একটা আবেগ ঝরে পড়ে।

তা ঠিক—তবে কি জানো—বর্ষায় যতই প্রিয়জন-সংসর্গ কাম্য হোক বা তার বিরহে ব্যাকুল হও—তবু ঘরে বসে এই বৃষ্টি উপভোগ করলে—মনে করো তোমার হাতের তৈরী চায়ে বা তার সংগে দুটো কচুরী কি ফুলুরি দিলে—একটা গান ধরলে—বর্ষার রাতটা কত মিঠে ঠেকে বলো তো!

বসন্তের মনেও যে কবিত্বের ছোপ ধরে না— এমন নয়! বর্ষা মানুষের মনকে মাদকতায় ভরে দেয়। বর্ষার এই মেঘান্ধকার চারিদিক ঢেকে দিয়ে ঘর আর বাইরের মাঝখানে একটা ঘন যবনিকা টেনে দেয় যেন—এই আড়ালে বাইরের দিকে ঘোরানো মন অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে। এই অবিশ্রান্ত বর্ষণের দিকে চেয়ে বসন্তের মনেও কি একটা অব্যক্ত বেদনা যেন মাথা কুটে মরছে; বাইরের অবিশ্রান্ত বৃষ্টির চেয়ে বসন্তের মনের এক নিগূঢ় বর্ষণ বড় হয়ে উঠেছে, পৃথিবীর সংগে কি তারও মন কাঁদছে নাকি? মালতীর কাছে সে যে কত ছোট—তা সে বুঝতে পারে যখন সে নিজেকে মেলে ধরে নিজের কাছে। মিথ্যা কথা দিয়ে আলাপ সুরু—মিথ্যা স্তোকে সেই আলাপের পরিপুষ্টি, কিন্তু মালতীর সরল বিশ্বাস, সরল আত্মসমর্পণ বসন্তের সেই মিথ্যাকে আরো স্পষ্ট করে দিয়েছে। আজ বর্ষার এই ব্যাকুলতায় যেন বসন্তের সেই অন্তর্বেদনা গুমরে গুমরে কেঁদে মরছে।

একটা রিক্সাটিক্সা দেখতে হয়—কি বলো? বসন্ত জিজ্ঞাসা করলো।

রাত ত' বাড়ছে, কিন্তু রিক্সা এই সময় এখানে চৌরংগীর ফাঁকা পথে কোথায় পাবে?—মালতী পাল্টা প্রশ্ন করে।

এখানে দাঁড়িয়ে এইভাবে ভেজা—এ বড় মর্মান্তিক, ভাবছি ভিজতে ভিজতে না হয় এগিয়েই গেলাম; একটা রিক্সা ধরে তোমাকে পোঁছে দিতে পারলে হয়। আজ আমার কাছে কয়েকটা টাকা আছে বলেই এ রকম ভাবতে পারছি—মালতী।

নির্মম প্রকৃতির এই অকৃপণ বর্ষণে নির্জন প্রান্তরে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভেজা—এতেও কি কোনো রোমাঞ্চ নেই? মালতীর মন চাইছে না এই ক্ষণটুকুকে এত তাড়াতাড়ি হারায়। কিন্তু সিক্ত বসনে সিক্ত কেশপাশ নিয়ে অসহায়ভাবে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়?

মালতী বললে—বেশ লাগছে, কিন্তু।

অবশ্যই, 'কপোত-কপোতী যথা'—মনে হচ্ছে। কিন্তু এর পর জ্বর, কাশি, নিউমোনিয়া—সে-ও খারাপ লাগবে না।—নিতান্ত ছন্দো-ভংগের রূঢ়তা নিয়ে বসন্ত বললে।

মালতী একটু আদরের সুরে বললে লাগবে না-ই ত'। আমি জ্বরে কাৎরাচ্ছি, আর তুমি পাশে বসে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছ, —বলো না, প্রিয়জনের সেই সেবার স্বর্গীয় আরাম কোন্ মেয়ের না ভাল লাগে?

নিবিড়ভাবে বসন্তের বুকের কাছে সরে আসে মালতী।

একদিন বসন্তকে ডেকে গজানন বললে, তোর মনের জোর আছে বসন্ত। প্রকাশ্যভাবে এই সহরে সকাল নেই, দুপুর নেই, রাত্তির নেই একটা বয়স্ক মেয়ে নিয়ে তুই হাঁটতে পারিস। আমি ত' এ রকম করে প্রেম করতেই পারতুম না।

বসন্ত চুপ করে থাকে।

গজানন জিজ্ঞাসা করে, তা, তুই কি একেবারেই মোদক ছেড়ে

দিয়েছিস ? বড় একটা আসিস্ না ত', মাঝে-মধ্যে এক-আধদিন ঢু মারিস, এই পর্যন্ত। তোকে আমরা ক'দিন থেকেই খুঁজছিলাম।

কেন ? কারুর দরখাস্ত লিখে দিতে হবে ?

না রে। সে দরকার আপাততঃ নেই। অন্য একটা জরুরী দরকার। আমরা বড় বিপদে পড়েছি বসন্ত।

গজুদার এই কাতর কণ্ঠস্বর ! কি ব্যাপার ?

তুই ত' আর এদিকে আসিস্ না, যে আমাদের কি ঘটছে, শুনবি।

ব্যাপার কি, খুলেই বল না। বসন্ত একটু কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলে।

জানিস ত' যে আমাদের থিয়েটারের একটা দল আছে। এতদিন ত' রমেন, টোনা ও মানিক এরাই ফিমেল পার্ট করতো, কিন্তু আজ-কাল আর সে রেওয়াজ নেই। এখন মেয়েরা যদি মেয়েদের পার্ট না করে ত' থিয়েটার জমে না। আর লোকে পয়সা দিয়ে দেখবেই বা কেন ? আমরা একটা চ্যারিটি শো করছি, চ্যারিটির টাকা অবশ্য আমরাই ভাগ করে নেব। আমাদের ক্লাবের কল্যাণেই তা খরচ করা হবে। কিন্তু সেই শো-তে আমরা একটা নাটক করছি। আর সে জন্যেই তোর শরণাপন্ন হচ্ছি।

কিন্তু গজুদা, আমি ত' এ ব্যাপারে একেবারেই কাজে আসবো না। থিয়েটার করতে পারি না, ভালও বাসি না। আর চ্যারিটির টিকিট বেচার ব্যাপারেও আমি একটা মূর্তিমান ফেলিওর।

সে ত' জানি। তবু তুই আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবি।

কিন্তু বিপদ যে কি তাই জানতে পারলুম না গজুদা। একটু খোলসা করে বলই না ছাই !—বসন্ত আগ্রহ দেখালো।

গজানন তার দিকে বেশ ভাল করে তাকালো একবার। পরে বললে, তুই-ই বাঁচাতে পারিস ভাই। বল, কথা রাখবি ?

কথা কি না জেনে কি করে প্রতিশ্রুতি দিই। আমার সাধ্যের মধ্যে হলে নিশ্চয়ই তা করবো।—এটুকু বলতে পারি।

গজানন বলতে লাগলো, ফিমেল পার্টের জন্যে গোটা চারেক অন্ততঃ মেয়ের দরকার। টোনা বইটা কেটেছেঁটে ওই রকম দাঁড় করিয়েছে। আমরা দুটি মেয়ে জোগাড় করতে পেরেছি, আর তুই যদি তোর মালতীকে আনিস আমাদের একটা পার্ট করে দিতে, তাহলেই বিপদ থেকে বাঁচতে পারি। এর জন্য অবশ্য ফি'জ পাবে। তুই ত' বলছিল, ওদের বড় অভাব ; না হয় কিছু বেশী টাকাই দেব।

বসন্ত চুপ করে প্রস্তাবটি শুনলে। কখনো সে মালতীর জন্যে কিছু করতে পারেনি, যদি য়্যামেচার আর্টিষ্ট হিসেবে মালতী একবার নাম করতে পারে, ওর একটা হিল্লে হয়। আর এখানে অভিনয় করলে ক্ষতি কি, বসন্ত থাকবে সংগে সংগে। রিহার্সেলে নিয়ে আসবে, অভিনয়ের দিন থাকবে কাছে, স্টেজে, গ্রীণরুমে। সে রাজি হয়ে গেল।

গজানন বললে, দ্যাটস্ গুড। শুধু একটা শো নয়, পর পর আরো কয়েকটা শো আছে। আজকাল য়্যামেচার থিয়েটারের ব্যবসাটি ভালো চলছে রে। যদি একবার মালতী শো করতে পারে যে ওর পার্টস আছে--ব্যাস্। ওর রোজগারে তুই বসে খাবি।

বসন্ত হন্তদন্ত হয়ে মালতীর বাড়ী ছুটলো—চাকরির এই খবরটা দেবার জন্যে। জয়নারায়ণের সামনেই সে প্রস্তাবটি রাখলে। প্রথম দুটি রাত্রের অভিনয়ের জন্যে পঁচিশ টাকা দেবে, কিন্তু এর পর প্রায়ই কল্ থাকবে ; আর একবার যদি নাম হয়ে যায়, তাহলে পাঁচ-সাতশো টাকা উপায় করাটা কিছু নয়।

কিন্তু বাবা, চিবিয়ে চিবিয়ে জয়নারায়ণ আরম্ভ করে, মিত্তির বাড়ীর মেয়ে যাবে পাবলিক থিয়েটারে, এ যে ভাবতেও পারছিনে। পর-পুরুষের সামনে ধিঙ্গি বয়সে আমার মেয়ে নাচছে, এ-ও শুনে যেতে হচ্ছে বাবা। অথচ না মত দিয়েও ত' পারি না। কতদিন যে না খেয়েই মেয়ে দুটি থাকে, তা বলে শেষ করা যাবে না। রাত্রে ত' মালতী আজ প্রায় বছরখানেক হলো কিছু খায় না। দেখো না, বয়সের মেয়ে, কিন্তু কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। ডান চোখ দিয়ে টপ টপ

করে জল ঝরে পড়তে লাগলো। জয়নারায়ণের। বসন্তের মত শক্ত ছেলেরও মনটা একটু টলে গেল।

মালতী একবেলা করে খায়? কিন্তু বাইরে থেকে ত' কিছুই বোঝবার উপায় নেই। গজাননের সংগে চ্যারিটি শো-তে বসন্ত খুব কাজ করবে। টিকিট বেচবে, দলকে পুষ্ট করবে। যাতে অন্ততঃ সে কিছু উপায় করতে পারে, তাই দিয়ে সে মালতীর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারবে। অভাবের সংগে যুদ্ধ করতে গিয়ে মালতী নিজেকে তিলে তিলে ধ্বংস করতে চলেছে, পরোক্ষভাবে আত্মহত্যার মন্ত্র নিয়েছে পরাজিতের মতো, তা থেকে ত' সে তাকে বাঁচাতে পারবে।

বসন্ত কুন্ঠিত ভাবে বললে, বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত জিনিষটা বিচার করতে হবে কাকাবাবু। আপনি উতলা হবেন না, এ চাকরিটা মালতীর ভালই হবে। আমি যখন রয়েছি দলে—

বসন্তের মনে পড়লো। যেদিন সে মালতীকে নিজের অনশনের কথা বলেছিল। গড়ের মাঠে বসে মালতীর দেওয়া চিনেবাদাম খেয়ে ব্রেকফাষ্ট করার গল্প করেছে; সেদিন মালতীর মনটা কি রকম বিষণ্ণ হয়েছিল। আজ সে বিস্মিত হলো, সংসারের কাজ করে, বাইরে চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়ে, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে পড়িয়ে মালতী তবু মুখে হাসির একটা স্নিগ্ধ পরিমণ্ডল তৈরী করে রেখেছে। অথচ দিনের পর দিন অনাহারে নিজেকে শেষ করে দিচ্ছে, সেদিকে তার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই।

মালতীকে সে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কোন মত কিছু দিলে না ত'?

আমার আবার মত কি! বাবা যখন রাজী, তুমি যখন বলছো, তখন আমার অমত থাকতেই পারে না। কিন্তু অভিনয় করা কি আমার দ্বারা হবে?

প্রথম প্রথম হয় না মালতী, কিন্তু থিয়েটার করতে করতে অভ্যাস হয়ে যায়। আর কি এমন শক্ত ব্যাপার! বাঁধা গৎ আছে, উইংসের

পাশ থেকে আমি বলে দেব, তুমি স্টেজে শুধু জোরে জোরে সেই কথাগুলো বলবে। এ এমন কিছু শক্ত নয়।

সত্যি, প্রথমটা শক্ত ঠেকেছিল মালতীর, এখন দেখলে, জিনিসটা তত শক্ত নয়। ছোট সাইড পার্ট থেকে নায়িকার পার্টে তার প্রমোশন হলো। শুধু গজাননের দল নয়, আরো দু'-চার জায়গা থেকে—এ-অফিস সে-অফিসের রিক্রিয়েসান ক্লাবে কল্ আসতে লাগলো।

আর্থিক অবস্থা একটু ফিরলো। অন্ততঃ দু' বেলা দু' মুঠো শাকান্নের ব্যবস্থা হলো। আর ঠিক সেই সময় জয়নারায়ণ মিত্রের অবস্থা বাড়াবাড়ির দিকে গেল। রাত জেগে, দিন জেগে সেবা করে এ ডাক্তার সে ডাক্তার ডেকে এনে বসন্ত সে ধাক্কাটা সামলে দিলে। মালতীকে সান্ত্বনা দিলে—কোন ভয় নেই, আমি যতক্ষণ আছি।

কিন্তু জয়নারায়ণের কথা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল, ডান দিকটাও যে পড়ে যাবে, ধীরে ধীরে সে সম্ভাবনাও প্রকট হয়ে উঠতে লাগলো। জয়নারাণের চিন্তা মেয়ের জন্য। মালতীর তবু বয়স হয়েছে—বসন্তের সংগে বন্ধুত্বও হয়েছে। সে বামুনের ছেলে নইলে জয়নারাণ হাতে পায়ে ধরে যাহোক একটা গতি করতো মালতীর, কিন্তু সাহস করেনি। তবে মনে যে একটা ক্ষাণ আশা ছিল না—তা নয়। আজকাল ত' অসবর্ণ বিবাহ·· প্রাচীন ভারতবর্ষের সেই অনুলোম প্রতিলোম বিয়ে হামেশাই চলছে। মালতীকে একদিন ইংগিত দিতে, সে তার বাবাকে ধমকে উঠেছিল। বলেছিল, আমার জন্যে কিছু ভেবো না। যা হোক করে চলবে, আর ভারতীরও একটা কিছু হবে। বসন্তদা যখন আছে।

জয়নারায়ণ অশ্রু ছলছল চোখে মালতীর মুখের দিকে তাকিয়ে, ডান হাতখানা কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে দিলে মালতীর দিকে।

কথা প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে জয়নারায়ণের। ডান হাত ডান পা নাড়তে খুব কষ্ট হয়। ধীরে ধীরে পরপারের ছাড়পত্র আসছে, সে

বুঝতে পারলো। কোনদিন সে সুখী হয়নি। যতদিন পয়সা ছিল, ততদিন অহংকারের উগ্রতায় ধরাকে সরা ভেবেছে। মালতীর মায়ের ওপর অত্যাচার করেছে কত, আজ ছবির মত সব মনে পড়ছে। জেদ, গর্ব, গোয়ার্তুমি সব কিছুর জন্যেই একটা অনুশোচনা জাগছে; তাই অসময়ে নিতান্ত অসহায় দুটো মেয়েকে প্রায় ডুবন্ত জলে ছেড়ে দিয়ে কোথাও গিয়ে তার স্বস্তি নেই; যেতেও সে চাইছে না; কিন্তু তার বিদায় বেলা ঘনিয়ে আসছে। জীবনের একি করুণ পরিহাস!

বসন্ত দু'জন ভদ্রলোককে নিয়ে একদিন দুপুরে এসে হাজির। জয়নারায়ণকে বললে, ইনি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত অতুলকুমার বসু। দরিদ্র কুলীনের মেয়ে খুঁজছেন, পছন্দ হলে কোন খরচ-খরচা লাগবে না। ইনি নিয়ে যাবেন বিয়ে করে।

মালতী ও ভারতী আড়াল থেকে আড়ি পেতে তার কাণ্ড দেখতে লাগলো। অনেক কষ্ট আর চেষ্টা করে জয়নারায়ণ জিজ্ঞাসা করলে, নিয়ে যাবেন মানে?

ও, বলিনি বুঝি? ইনি বর্মায় থাকেন, সেখানকার খুব বড় মার্চেন্ট। বিয়ে করে সেখানে বউকে নিয়ে যাবেন। সহসা যে কোলকাতায় আর আসতে পারবে এমন নয়। বসন্ত বললে।

আড়াল থেকে কথাটা শুনে মালতীর বুকটা ধক্ করে উঠলো। কে যেন হাতুড়ি মারলে আচম্কা। বসন্ত মালতীর জন্যে একি সম্বন্ধ নিয়ে এসেছে? ধীরে ধীরে মালতী যে তার কত কাছে এসেছে, নিজের জীবনের সুখ দুঃখকে এই ভবঘুরে ছন্নছাড়া বেকার ছেলেটির সুখ দুঃখের সংগে মিলিয়ে দিয়েছে, তা কি সে বুঝতে পারে নি?

অতুল বসু এবং তাঁর সংগী মালতী এবং ভারতী দুজনকেই দেখলেন, কিন্তু পছন্দ হলো ভারতীকে। যদি রাজি থাকেন জয়নারায়ণবাবু, তবে আসছে শুক্রবারই বিয়ে হতে পারে। শনিবার বাদ দিয়ে রোববার দিন সকালেই রওনা দিতে হবে অতুলবাবুর দেশে —বীরভূমে। সেখানে দিন কয়েক থেকেই বর্মায়।

মালতী বাবাকে ধরে পড়লো, তুমি অমত করো না বাবা, ভারতী

এতে সুখী হবে। তাছাড়া ওর যদি একটা পাকা আস্তানা হয়; যদি সুখী হয়, ধনীর বউ হয়, আমারও বিপদ আপদে ও আমাকে দেখতে পারবে।

তন্দ্রা জড়িয়ে আসছে জয়নারায়ণের। মৃত্যুর তন্দ্রা নাকি? বসন্তর দিকে তাকিয়ে সে তাকে অনুরোধ জানায়, মালতীকে যেন সে না ফেলে। যেমন করে ভারতীর একটা হিল্লে করেছে। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে, ধরা গলাতেও বাকী কথা কটি আর শেষ করতে পারে না।

অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে বিয়ে হোল ভারতীর। বর হিসেবে অতুল বসুর একটু বেশী বয়স হয়েছে, কিন্তু অর্থবান সে; নিজেই খরচ করে বিয়ে করছে, বউ নিয়ে সুদূর দেশে চলে যাবে বলে।

জয়নারায়ণ শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। মালতী রুদ্ধবাক্ হয়ে যায়! কিন্তু ভারতী চলে যাবার পর আর একমাসও কাটলো না। তারপর একদিন পৃথিবীর সব নিয়মই যান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হতে থাকলো; শুধু জয়নারায়ণ মিত্রের হৃদ্‌স্পন্দন অতর্কিতে থেমে গেল।

মালতী একদিন বললে, ভাবছি থিয়েটার করা এবার ছেড়ে দেব। একটা পেট যা হোক করে চলে যাবে।

বসন্ত জবাব দিলে, যা হোকের বদলে না হয় থিয়েটারই করলে।

ভালো লাগে না। বোন্‌টা সেই যে বর্মায় গেল, আর কোন খবর নেই। ঠিকানা জানিয়ে একটা চিঠি পর্যন্ত দিলে না, যার দুঃখ বাবা সহ্য করতে পারলেন না। মালতী দম নেবার জন্যে থামলে।

বসন্ত বললে, তোমার সর্দি জ্বরের পর সেই যে শরীরটা ভাঙলো, আর আগের মতো হলো না! তুমি কি যত্ন নিচ্ছ না শরীরের?

কি হবে নিজেকে অত যত্ন করে?

নিজের জন্যে অবশ্য প্রয়োজন নেই তার, কিন্তু তোমার জন্যে যখন আর একজন ভাবে, কষ্ট পায়—তার দিকে চেয়েও ত' একটু যত্ন নিতে পারো! বসন্ত বললে।

তুমি আমার জন্যে সত্যিই ভাবো, বসন্তদা ?

কেন—তোমার সন্দেহ হচ্ছে ?

না। কিন্তু এক জায়গায় আমি ভেবে পাই না কেন তুমি আমাকে এমন অগৌরবের মধ্যে ফেলে দাও ?

বসন্ত বিস্মিত হয়ে মালতীর মুখের দিকে তাকালো। আসন্ন বর্ষার পূর্বাভাস যেন থম্ থম করছে সে মুখে। বেদনায় ভারাক্রান্ত, বিষণ্ণতায় ম্লান বসন্ত ক্ষুব্ধস্বরে অথচ ধীর গলায় জিজ্ঞাসা করলো, ব্যাপার কি বলো তো ? তোমাকে আমি অগৌরবের মধ্যে ঠেলে দিয়েছি ? থিয়েটারে কোন শালা কিছু—

না, না, গজাননবাবুদের তুমি চটিয়ো না। ওঁরা কেন জানি না আমার প্রতি কোন খারাপ ব্যবহার করেন না।

তা হলে ? বসন্ত ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

এই পাড়ার লোক, আশেপাশের লোক যে নিন্দে করে সে কি তুমি বোঝ না ? তুমি আসো যাও—এতে ওরা আপত্তি করে, যা তা বলে—মালতী চুপ করলো।

বসন্ত মূঢ়ের মতো মালতীর দিকে তাকালো একবার। তারপর একটু ভেবে বললে, কিন্তু তুমি কি আমাকে আসতে নিষেধ করছো ?

মালতী কোন কথা না বলে ভীরুভাবে স্তিমিত দুটি চোখ তার দিকে তুলে ধরলে। ম্লান করুণ বেদনাহত সেই চোখ দুটিতে কি যেন মদির মায়া মেশানো ছিল। বসন্ত ছটফট করে উঠলো। কুকুর চিৎকার করুক রাস্তায়, উটের দল মরুভূমি পার হয়ে যাবে। সে উন্মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলে,—বলুক শালারা, যত পারে কুৎসা রটাক, তাতে কিছু যায় আসে না। আমি এখানে আসবো ; কেউ বাধা দিতে পারবে না, বরং আসার অধিকার আমি অর্জন করে নেব। চলো মালতী, আমাদের সম্পর্কটা আরো পরিষ্কার করে ফেলি ; রেজিষ্ট্রেসন অফিসে চলো একদিন সময় করে।

মালতী চুল বাঁধছে আয়নার সামনে বসে। বসন্ত একটা মোড়ায়

বসে রেসের বই দেখছিল। দুটো উটকো পয়সা উপায়ের ফিকিরে সে কখনো সখনো প্লেস উইন খেলছে আজকাল। মালতী বাধা দেয় না, দিলে শোনে না বলেই সে এই ব্যাপারটায় নিরাসক্তি দেখায়।

মালতী বললে, আমার কপালেও যে সিঁদুর উঠবে কোনদিন এ কথা ভাবিনি। এজন্যে আমি সত্যি তোমার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো।

অর্থাৎ। বসন্ত রেসের বই থেকে চোখ তুলে প্রশ্ন করে।

কোন স্ত্রী তার স্বামীকে এ জাতীয় কথা বলেছে, এমন ঘটনা বসন্তের জানা নেই। মালতী কি তাকে স্বীকার করতে পারছে না? না, তার বাইরের জগৎ ও জীবনের দিকে মুখ ঘোরানো রয়েছে বলেই এত আক্ষেপ? সে নেশাখোর, ধাপ্পাবাজ, রেস্যুড়ে, কিন্তু তবুও সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে মালতীকে। তার দামও কি মালতী দিতে চায় না?

মালতীর মনটা পরিষ্কার করে জানতে হবে। কেন তার মনে এই বেদনার সুর? এখন ত' আর দৈন্যের সেই রুক্ষ পরিবেশ নেই। থিয়েটার আর মালতীকে করতে হয় না, বসন্তই একটা মার্চেন্ট অফিসের সেলস্ ম্যানেজার হয়ে গেছে। মাসে প্রায় চার শো টাকা আসছে। তবু কেন মালতীর মুখের হাসি এমন শুকনো মনে হয়?

শুধু আজকের এই কথা নয়। মালতীর ব্যবহারে একটা প্রচ্ছন্ন ঔদাসীন্য এসেছে, বসন্ত বুঝতে পারে। সে জোর করেই এই বিয়ে করেছে। হরিশরণ মামাকে অবধি জানায়নি। সে শুধু মামার আশ্রয় ছাড়ার সময় মামিমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এসেছে, নিজের জীবনের এই নতুন অধ্যায়ের কথা ঘুণাক্ষরেও জানায়নি। দিগন্তের উদ্দেশ্যে বের হওয়া নৌকা যেমন ক্ষণিকের জন্যে তীরের আশ্রয় থেকে নোঙর তুলে মাঝ গাঙে আবার বদর বদর বলে পাড়ি জমায়, বসন্তেরও ঠিক তেমনি অবস্থা। ইদানীং সে শুনেছিল, তার মা আসবে, জেঠি-মা আসবে কোলকাতায়। তার বিয়ের জন্যে মেয়ে ঠিক করেছেন তাঁরা, সেই মেয়ের সংগে শুভ কাজ সারবার জন্যে। কন্যা পক্ষের লোকেরাই নাকি খরচ করে আনাচ্ছে তাঁদের।

হরিশরণ মামার এই ঘোষণায় সে গুরুত্ব দেয় নি। তার মা জেঠিমা যদি আসে, সে তাদের মতকে উপেক্ষা করতে পারবে না। অভাবের তাড়নায় যদি কিছু টাকা ওপক্ষের কাছ থেকে নিয়েই থাকে, সে তা ফিরিয়ে দেবে। একবার ভাবলে, মামাকে সব খুলে বলেই আসে যে সে বিয়ে করেছে। আবার মনে করলে, শোক তাপে জর্জর, দুঃখ বিপর্যয়ে কাতর তার মা জেঠিমার বুকে হঠাৎ আঘাতের মতো হয়তো এই অসবর্ণ বিয়ের খবরটা বাজবে। তার চেয়ে চুপ করে ঘটনার প্রবাহের প্রতি লক্ষ্য রাখাই ভালো মনে করে সে নীরব হয়েই চলে এসেছে। একদিকে মা জেঠিমাকে ত্যাগ করেছে, সমাজের শাসন উপেক্ষা করেছে, আর অন্যদিকে মালতীর স্নেহ ছলছল বেদনাবিহ্বল শ্যাম মুখখানা মনে পড়ছে। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই মালতীর মন কেমন যেন জীর্ণ হয়ে পড়েছে। কখনোই যেন সে বিস্তৃত করে, মুক্ত পক্ষ হয়ে বসন্তের কাছে নিজেকে মেলে ধরতে পারে নি।

আজ বসন্ত কিছুতেই ছাড়বে না। মালতীর কি হয়েছে, তা জানতেই হবে তাকে। কেন এমন ছাড়া ছাড়া ব্যবহার, কেন এমন ঔদাসীন্যের চাবুক তার পিঠে পড়ছে। আদর্শ সুখস্বপ্নের, আদর্শ দাম্পত্যের ছবি, যা তার মনে ছিল, তাকে সফল করে তুলতেই সে চায়। অথচ মালতী ধীরে ধীরে নিরাসক্ত হয়ে পড়ছে। তাকে আর ভালো লাগছে না বুঝি? তাই ভালবাসার বদলে কৃতজ্ঞতা বাসা বেঁধেছে?

বসন্ত বলে চললো, হয়তো তোমার আর পছন্দ হয় না আমাকে। দূর থেকে দেখে এক রকম ভেবেছিলে, এখন মনটা পর্যন্ত পরিষ্কার করে সদা সর্বদা দেখতে পারছো, ঘাবড়ে গেছ বোধহয় আমি ছেলেটা এমন! নেশা ভাঙ করি, রেস খেলি—

শাসনের ভংগীতে কড়া সুরে মালতী বাধা দিয়ে বলে উঠলো, কি বাজে বকছো। তোমার সে সব পরিচয় আমি আগেই পেয়েছি। আমার দুঃখ তোমাকে নিয়ে নয়, আমি তোমার দুঃখের কারণ যদি হই —এই ভেবেই শুকিয়ে মরছি।

বসন্ত নরম হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কিসের জন্য সেই শংকা ?

আজ থাক, আর একদিন বলব। তুমি এমন করে আমার কাছে তোমার মনের দৈন্য দেখিয়ো না, অনুরোধ জানিয়ো না। আমি যে সহ্য করতে পারি না। কান্নার আবেগে মালতীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

বসন্ত সেদিন আর কোন কথা বাড়ালো না। শুধু ভাবলো, আজ যে বসন্তের জন্মদিন একথা মালতী জানে, তবু সে তার প্রতি এতটুকু স্নেহশীতল সোহাগ মদির ব্যবহার করলো না দেখে সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল। অথচ গত বছর? তখন ত' সবে আলাপের সুরু, মাস কয়েক আলাপের পর পয়লা আশ্বিন তারিখটা শুনেই মালতীর সে কি তৎপরতা! দুজনে সন্ধ্যায় গড়ের মাঠে বসে আড্ডা দিচ্ছিল। বেকার জীবনের পারস্পরিক প্রেম নিবেদনের যেমন মামুলী কথাবার্তা হয় আব কি! হঠাৎ কি কথায় কথায় বাংলা তারিখেব কথা উঠলো। বসন্ত বললে, বাংলা তারিখের সংগে টাকা পয়সার লেনদেন না থাকলে কেউ কোন দিন বাংলা তারিখ মনে রাখে না। তুমি বলতে পারো—আজ বাংলা কোন মাস, আর কোন তারিখ ?

তুমি পারো ? মালতী পাল্টা প্রশ্ন করলে।

পারি।

আমিও পারি।

বেশ, বলো, বসন্ত বললে।

ভাদ্র মাস শেষ হয়ে এসেছে, আজ বোধ হয় আটাশে কি উনত্রিশে। মালতী বললে।

হলো না, ইংরাজী তারিখ মনে রেখে আন্দাজ চালালে কি হবে। আজ পয়লা আশ্বিন!—বসন্ত বললে।

কি করে আপনি তারিখটা মনে রেখেছেন? এমন স্পষ্ট করে ঠিক ঠিক বাংলা তারিখ বলতে পারে, আমি তো আর কাউকে দেখিনি।

আমারও ঠিক থাকে না বাংলা তারিখ, তবে মা এই তারিখে

আমাকে প্রত্যেক বছর আশীর্বাদ করেন, মা জেঠিমা আগাম পোষ্টকার্ড লিখেছেন তাই জানি।

কেন ?

এটা আমার জন্ম তারিখ। মা জেঠিমা আজো আমাকে কচি ছেলে মনে করে এই দিনে আশীর্বাদ পাঠান, ঠাকুরের কাছে মানত করেন, আমার যেন ভালো হয়।

মালতী চঞ্চল হয়ে উঠলো, বললে—একটু বসুন, আমি এক্ষুনি আসছি। বলেই প্রায় ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল। বসন্ত বোকার মত বসে রইলো। উঠে জাপটে ধরবে সে মালতীকে, শোভনতায় তা বাধবে ভেবে সে বসে রইলো। কিছুক্ষণ পরে মালতী ফিরে এল, একটা দামী রুমাল কিনে, আর একটিন চার্চম্যান্ সিগারেট নিয়ে। বার্থ ডে গিফ্ট্। শুধু মনে রাখার ভীরু আশ্বাস নিয়ে। না, না, এ আপনাকে নিতেই হবে, কি জানি কেন মনে হয়, আপনি আমার কত আপন জন। এই সব টুক্‌রো টুক্‌রো কত কথাই না মালতী সেদিন বলেছিল। আর আজ ?

আজকের দিনে অন্ততঃ মালতী নিজে কিছু ভালোটা মন্দটা রেঁধে খাওয়াবে, এই রকম একটা ছোট্ট আশাও বসন্ত করেছিল। রেসে শনিবার কিছু উটকো টাকা পেয়েছে, আজ সকালে একটু বেশীরকম বাজারও হয়েছিল, কিন্তু মালতী বাড়তি কিছু করে নি।

রাত্রে খাবার সময় শুধু বসন্ত বললে, আজ আশা করেছিলাম, তুমি একটা স্পেশাল কিছু রান্না করবে। পয়লা আশ্বিনটা অন্ততঃ এভাবে গতানুগতিক করে কাটাবে না —

প্রথমে মালতী পয়লা আশ্বিনের ইংগিতটুকু বুঝতে পারে নি, পরে সে বুঝলো। মনটা তার এক নিমিষেই ভেঙে পড়লো, মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কি ছাই শরীর হয়েছে আমার যে কিছু মনেও পড়ে না! তুমি ত' বলবে আগে, ছি, ছি, আজ তোমার জন্মদিন।

বসন্তের খাওয়া চুকলে মালতী গলবস্ত্র হয়ে তাকে নমস্কার করে বললে, আজ তুমি আমার নমস্কার নাও। এছাড়া আর কিছু দিতে

পারছি না। শরীরটা আমার এমনই ভেঙে গেছে। কিছুই যেন উৎসাহ পাই না। কোন কিছুতেই জোর পাই না—

বসন্তের পায়ের কাছে ঢিপ করে মালতী নমস্কার করলে, বসন্ত দুহাতে মালতীকে তুলে ধরলে, চমকে গেল মালতীর গায়ে হাত দিয়ে, একি! মালতী? তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে, তোমার জ্বর এসেছে নাকি?

জ্বর? হ্যাঁ! সন্ধ্যের দিকে রোজ আসে, রাত্তির দশটা এগারোটায় ছেড়ে যায়, আর একটু পরে দেখবে, গা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বলে মালতী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, বোধহয় বসন্তের জন্যে পান সাজতে।

বসন্ত পিছু পিছু গেল বাইরে। মালতীর কাছে গিয়ে বললে, কতদিন থেকে তোমার এ রকম জ্বর হচ্ছে?

ঠিক বলতে পারি না। মুখ নীচু করে পান সাজতে সাজতে মালতী বললে।

আমাকে তুমি জানাওনি কেন?

কোনদিন ত' তুমি জানতে চাওনি। রাত্তির দশটা এগারোটায় ফেরো আড্ডা দিয়ে। কোনদিন নেশা করে সম্বিৎ হারিয়ে—তখন কী করে তোমাকে বলবো বলো! কতদিন ত' বলেছি একদিন সব জানাবো। একটু থেমে মালতী বলতে থাকে, আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে···!

কিসের সন্দেহ? বাধা দিয়ে বসন্ত বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টি হেনে জিজ্ঞাসা করলে।

কেমন যেন মনে হচ্ছে বোধ হয় আমি আর বাঁচবো না। আমার মন বলছে, করুণাসিক্ত কণ্ঠে মালতী বলতে গিয়ে থেমে গেল।

কি হয়েছে তোমার, বলো ত' বলে বসন্ত মালতীকে ধরে তুলে নিয়ে গেল ঘরে। আদর সোহাগে কাছে টেনে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি ভাবছো আমি তোমাকে অবহেলা করছি, তা নয়, মালতী। আমার স্বভাবটা এই রকম। এতদিন পয়সা ছিল না, বন্ধুবান্ধবদের কৃপায় নির্ভর করে চলেছি। ওরা পয়সা জুগিয়েছে হোটেলে খাবার, কখনো

নেশার বস্তু দিয়েছে, বিনিময়ে কখনো একটা বিড়ি নিয়েছে। আজ দুটো পয়সার মুখ দেখেছি। এখন যদি ওদের আমি কাছে না যাই, বেইমানি করা হবে না? এতে তোমার সম্মতি আছে ধরে নিয়েই আমি হয়তো এক আধদিন নিজেকে বেসামাল করেছি। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো, এক মুহূর্তের জন্যে তোমাকে অবহেলা করি নি।

মালতী কিছুতেই সেদিন তার অসুখের ইতিবৃত্ত বললে না বসন্তকে। কোথায় যেন একটা অভিমান তাকে বেদনাতুর করে তুলেছে।

পরদিনই বসন্ত শহরের এক নামকরা ডাক্তার এনে হাজির করে বললে—সম্পূর্ণরূপে এঁর চিকিৎসা শুরু করুন, যা যা করণীয়, যত যত টাকা লাগে। মানুষটা ত' আগে! বসন্ত যেন আর গুছিয়ে কথা বলতেই পারে না।

এ ধরণের কথাবার্তা শুনে ডাক্তারবাবু শুধু একটু হাসলেন।

চিকিৎসা শুরু হতে না হতেই ধরা পড়লো মালতীর বড় রকমের একটা কিছু হয়েছে। জ্বর, কাসি, তার সংগে শরীরটা দুর্বল বোধ হচ্ছে। গোড়া থেকেই একটু সাবধান হওয়া দরকার ছিল। ছ' মাস এই ব্যাধি পুষে রাখাটা ঠিক হয় নি। —ডাক্তারবাবু এই রকম সব তিরস্কার করতে শুরু করলেন।

একটা প্লেট নিতে হলো। বুকের ছবি তোলা হ'লে, সে ছবি দেখে ডাক্তারবাবু শুদ্ধ চমকে উঠলেন। কী সাংঘাতিক, এ যে গ্যালপিং থাইসিস। এতদিন অবহেলা করাটা উচিত হয় নি।

ডাক্তারবাবু মালতীর সামনে যতটা না বললেন, তার চেয়ে ঢের বেশী তিরস্কার করলেন বসন্তকে আড়ালে নিয়ে। এ অবস্থায় মালতীকে সারিয়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন। সম্পূর্ণ বিশ্রাম, কঠোর চিকিৎসা আর পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য।

বসন্ত চোরের মত সংকুচিত স্বরে বললে, আজকাল ত' শুনেছি টি. বি. রোগে লোক মরে না। ভালোভাবে চিকিৎসা হলে বেঁচে যায়।

শতকরা আশিটি কেস সারে। কিন্তু বাকী কুড়িটিকে এখনো কায়দা করা যায় না। তবে জানবেন এ কেসটা খুব খারাপ, অল্‌রেডি ছুটো লাংসই য়্যাফেক্টেড। আপনি যদি রীতিমতো যত্ন না করেন, তাহ্‌লে খুব আশার কথা শোনাতে পারবো না। আর একটা কথা স্পষ্টই বলে রাখি, আপনি একটু সাবধান থাকবেন। সংসারে তৃতীয় লোক নেই আপনাদের তাই বললাম। এমন কি এক ঘরে থাকা চলবে না, এক বিছানায় ত' নয়ই। অসুখ সেরে গেলেও জানবেন, আগামী ছ' সাত বছরের মধ্যে যেন আপনাদের ছেলেপুলে না হয়। আবার যদি অসুখ হয়—তবে আর উপায় থাকবে না। অবশ্য এ ধাক্কা ত' আগে সামলান।

ক'দিনের স্ট্রেপটোমাইসিন ইত্যাদি চিকিৎসায় আর শরীরের প্রতি নজর রাখায় মালতীর জ্বরটা কমে গেল। এক একদিন জ্বর হয়ও না। বসন্তের মুখ আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, মালতীরও কেমন মনে হলো, হয়তো এ যাত্রা সে বেঁচে গেল। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল মালতীর রোগটা যেন একটু বেশী রকম বাড়াবাড়ির দিকে। কাসির সংগে রক্তের ছিটে দেখা গেল। ছু' একবার রক্ত বমির মতো গল গল করে রক্তও বের হলো।

বসন্ত তবু আশ্বাস দেয়, কোন ভয় নেই। এ রোগ আজকাল ছুরারোগ্য নয়। ডাক্তারদের কাছে, আধুনিক চিকিৎসার কাছে ডাল ভাতের মতো সহজ ব্যাপার। তুমি কিছু ভেবো না মালতী।

নিজের জন্যে কখনো কিছু ভাবি না, ভয়ও করি না। কিন্তু— মালতী একটানা কথা বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়ে।

কিন্তু কি, মালতী? বসন্তের কণ্ঠস্বরে ব্যাকুল আতুরতা ঝরে পড়ে।

আমার ভয় শুধু তোমাকে নিয়ে। তোমার কোন কল্যাণ কোনদিন করতে পারি নি। এক ঘর এক দোর—ছোঁয়াছুঁয়ির মধ্যে দিয়ে যদি তোমার একটা কিছু হয়ে যায়। আমার শুধু তাই ভয় করে।

আজকাল আর এ ভয় নেই। টি. বি. এখন ঘরে ঘরে।

কোলকাতা শহরের যত লোক, তার চার ভাগের এক ভাগের ত' বটেই, তার বেশীও হতে পারে। এতে এখন ভয়ের কিছু নেই।

কিন্তু বসন্ত যতই আশ্বাস দিক, মালতীর মনের হাহাকার ঘোচে না। বসন্তের জীবনের পরিচয় সে জানে। দুর্যোগ দুর্দশার মধ্যে দাঁড়িয়ে দুঃখ দারিদ্র্যকে গ্রাহ্য না করে মানুষটা এই পর্যন্ত এসে পৌঁছিয়েছে। মালতী সেবা-যত্নে বসন্তের জীবনে ফুল হয়ে ফুটবে এই প্রতিজ্ঞা করেছিল; কিন্তু কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। তার নিজের জীবনের ওপর দিয়েও কম ঝঞ্ঝাট যায় নি। সব বিপর্যয় পার করে যদি একটু আশ্রয় মিললো, কিন্তু তার নিজের ভাগ্য কি নিষ্ঠুর! সামান্য একটু শান্তি, একটু আদর, কি একটু প্রেমপ্রীতি সোহাগের মধ্যে দিয়ে কাটাবার উপায় নেই ক'টা দিন।

ডাক্তার বদল করা হলো। ইনিও এক কথা বললেন, কেসটা সিরিয়স, একটু বেশী যত্ন নিতে হবে।

বসন্ত জিজ্ঞাসা করলে, সারবে ত'?

সারবে না কেন —তবে কাঠখড় অনেক পোড়াতে হবে।

আগে হলে একটা কুটোও জ্বালাতে পারতুম না। এখন কিছুটা খরচ খরচা করতে পারবো ডাক্তারবাবু। ইউ প্লিজ টেক আপ দি কেস। বসন্তের আন্তরিক আকুলতা ডাক্তারবাবুকে স্পর্শ করলো বলে মনে হলো।

পাড়ার লোকেরা যেন একটু বেশী রকম ব্যস্ত হয়ে উঠলো। মালতীর এই অসুখ---স্বামীটা কেন আরো বেশী যত্ন নিচ্ছে না, ব্যবস্থা করছে না কেন ভালভাবে—এ নিয়ে ঘোঁট বসতে সুরু হলো। বসন্ত সেদিকে কান দিলে না, বরং অগ্রাহ্যই করতে লাগলো বেশী—ফলে, ফল হলো উল্টো।

পাড়ার একজন বয়স্ক লোক, প্রায় প্রৌঢ়ই বলতে হবে, একদিন বসন্তকে ডেকে বললে---ওহে ছোকরা, বাড়ীতে ত' টি. বি. রুগী পুষে রেখে দিয়েছো। বলি, ব্যাপারখানা কি—পাড়াশুদ্ধ মজাতে চাও?

বসন্ত নীরব থেকেই শুধু বক্তার চোখের দিকে তাকালো। বক্তা

বলতে লাগলো—কথাটা বুঝি কানেই গেল না? যক্ষ্মা রুগীর থুথু-গয়ার, রক্তফক্ত—সবই ত' দেখি এখানে ফেলে যাচ্ছো—বলি এটা 'পেয়েছো কি?

বসন্ত বললে—যতটা পারি সাবধান থাকার চেষ্টা করি। ওই থুথু-গয়ারে ব্লিচিং পাউডার, ডেটল, লাইজল—

বাধা দিয়ে লোকটি বললে---ছ্যাখো ছোকরা, রুগী যদি সাতদিনের মধ্যে পৃথক করতে না পারো, পাড়া থেকে সরাতে না পারো, আমরা তবে এর একটা বিহিত করবো।

কি করবে এরা? যদি বসন্তের ওপর রাগ করে কোনো হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় মালতীকে—তবে ত' শাপে বর হবে।

ইদানীং বসন্তও সে চেষ্টা করছে। একে তাকে ধরছে, কেউ কিছু করবে না জেনেও সে তাদের স্তোকবাক্যে মিথ্যা আশ্বাসের স্বাদ পাচ্ছে। তবে নিজেদের প্রাণের দায়ে বসন্তের ওপর রাগ করেই হোক, আর টেক্কা মেরেই হোক যদি মালতীকে কোথাও সরিয়ে দিতে পারে—বসন্তের ঝঞ্ঝাট বাঁচে অনেকটা। অফিসের কাজ থেকে ছুটি নেওয়া চলে না, মাইনে কাটা যাবে। ঘরে এসেও রোগীর সেবা শুশ্রূষা, ডাক্তারের বাড়ী ছোটাছুটি, ওষুধ আনা-নেওয়া, নিজের খাওয়া দাওয়ার কথা না হয় বাদই দিলাম।

বসন্তই ডাক্তারবাবুর কাছে পরামর্শ নেবার জন্যে কথাটা তুললে; আচ্ছা কোন হাসপাতালে রাখলে হয় না?

ডাক্তারবাবু বললেন, রাখতে পারলে ত' খুবই ভালো হয়। পারবেন খরচ চালাতে! খুব ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।

আপনার ত' প্রথম দিনের সেই কথা ডাক্তারবাবু, কিছু কাঠ খড় পোড়াতে হবে। আমি কাঠ খড়ের যৎকিঞ্চিৎ ব্যবস্থা করতে পারবো বলে মনে করি।

তাহলে বাইরে ভালো কোন স্যানাটোরিয়ামে রাখার ব্যবস্থা করুন। অল্পদিনের মধ্যেই সি উইল পারফেক্টলি কাম্ রাউণ্ড, একেবারে সেরে উঠবে।

আপনার কোন জানাশোনা জায়গা আছে ডাক্তারবাবু? আপনারা ত' এই লাইনের লোক।

পেণ্ডারোডে আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি, তবে একটু খরচ বেশী পড়বে, ওখানে মেজর দত্ত আছেন। আমারই প্রফেসর উনি। বর্তমানে টি. বি. স্পেশালিষ্ট বলেই পরিচিত।

দিন না তাই ব্যবস্থা করে, যত তাড়াতাড়ি হয় ডাক্তারবাবু।—বসন্তের কণ্ঠে বেদনার একটা চাপা কান্না যেন ধ্বনিত হয়ে উঠলো।

ডাক্তারবাবু বললেন, এখনো ঘাবড়াবার কোন কারণ হয়নি বসন্তবাবু। হলে আমি নিশ্চিত বলতাম। আমি মেজর দত্তকে চিঠিতে সব লিখি, তাঁর পরামর্শ নিই, আর ইতিমধ্যে একবার রোগীর একটা এক্স-রে করিয়ে নিন।

বসন্ত বললে, একটু তাড়াতাড়ি হলে বোধ হয় ভাল হতো, কোলকাতার যা দূষিত বাতাস।

ডাক্তারবাবু মৃদু হেসে বললেন, এসব রোগ ত' ঝপ করে সারে না বসন্তবাবু, সময় নেবে। অমন ব্যস্ত বা ব্যাকুল হলে চলবে না তো।

কিন্তু বসন্ত মালতীকে সরিয়ে রাখার যে ব্যবস্থা করতে চলেছে, মালতী তা স্বীকার করে নেবে কি? না নিলে চলবে কেন? সে নিজে ত' মজেছে, আর পাঁচজনকেও মজাবে। সেকথা পাড়ার হিতৈষীরা যেমন ভাবছেন, তেমন করে মালতী কি একবারও চিন্তা করছে না? কিন্তু বসন্তকে ছেড়ে সে কোথাও যেতে চায় না। একথা বলে হাসপাতালে যাওয়া সে ঠেকাতে পারবে না। যদি বসন্তকেই চায়, তার একান্ত আপনার করে রাখতে চায়, তবে তার কাছ থেকে কিছুদিন ত' মালতীকে সরে থাকতেই হবে।

মালতী বললে, মরবার সময় অন্ততঃ তোমার কাছে থেকে, তোমার কোলে মাথা রেখে মররো, এই আশা করেছিলাম। সে সাধটুকুও পূর্ণ হবে না? তুমি থাকবে কোলকাতায়, আমি পেণ্ডা

রোডে। পাঁচশো মাইল দূরে। হঠাৎ কখন কি হয়, কে বলতে পারে?

এ তুমি কি বাজে কথা ভাবছো, মালতী? তোমাকে ছেড়ে থাকতে ত' আমারও কম কষ্ট হবে না। কিন্তু তোমার জীবনের দিকে চেয়ে, অসুখের কথা ভেবে, এই ব্যবস্থায় মত দিতে হয়েছে।

মালতী রাজি না হলেও বসন্তকে ব্যবস্থা করতে হলো; পেণ্ডা রোডের স্বাস্থ্যাবাসে তাকে রেখে আসার। শতকরা পঁচানব্বই জন রোগী সেখান থেকে সেরে ফিরে আসছে, সেখানে যাওয়ার কোন ভয় বা ভাবনা নেই, শুধু যা খরচপত্র একটু বেশী। বরং সেখানে সিট পাওয়াই হচ্ছে একটা ভাগ্যের কথা।

তবু যাওয়ার দিনে মালতীর চোখে জল এলো। এই শহরের শ্মশানে তার মা-বাবার শেষ শয্যা সাজানো হয়েছে। এখানে সে-ও চোখ বুজবে ভরসা করেছিল। বসন্তের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু এ তাকে কোথায় নির্বাসন দেওয়া হচ্ছে!

আমিও ত' যাচ্ছি তোমার সংগে, যদি জায়গাটা ভালো না লাগে, সেখানকার কোন ব্যবস্থা পছন্দসই না হয়, আমার সংগেই তুমি ফিরে আসবে। এতে কান্নাকাটি করার কি আছে?—বসন্ত আশ্বাস দেয় মালতীকে।

বিলাসপুরে গাড়ী বদল করতে হয়। সেখানে সকালেই পৌঁছনো গেল—সম্পূর্ণ একটা রাত ট্রেণে কাটিয়ে। জংসন স্টেশন, লোকজন, হৈ চৈ হট্টগোল তবু আপার ক্লাস ওয়েটিং রুম অপেক্ষাকৃত শান্ত। মালতী সেখানে এসে ক্লান্তি বোধ করছিল। সে আর কখনো এদিকে আসে নি। নতুন জায়গা, পথের দৃশ্য ভালই লাগছিল, বিশেষ করে প্রত্যুষে রায়গড়ের পর থেকে দু' পাশের গাছপালা, পাহাড়ে জায়গা, নুড়ি পাথরের টিলা। বিচিত্র ধরনের মানুষ স্টেশনে স্টেশনে। মালতীর ভালই লাগছিল। কিন্তু বিলাসপুরে নেমে সে ক্লান্ত হয়ে পড়লো।

মালতী জিজ্ঞাসা করলে, বল না গো—বিলাসপুর নামটা এত চেনা মনে হচ্ছে কেন ?

বসন্ত বললে, এ একটা বিখ্যাত স্টেশন মধ্যপ্রদেশের, তাই।

না, তা নয়। কোথায় যেন পড়েছি পড়েছি মনে হচ্ছে।

মুখ হাত ধুয়ে চা জলখাবার খাওয়া হলো। স্যাডোলের গাড়ি ধরতে হবে এখান থেকে। স্যাডোলের পথেই পেণ্ড্রা রোড। বড় স্বাস্থ্যকর জায়গা।

মালতী বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। রবি ঠাকুরের কবিতায় পড়েছি। তুমিও ত' জানো, পলাতকায় আছে না ?

বসন্তের এবার স্পষ্ট মনে পড়লো রবীন্দ্রনাথের 'ফাঁকি' কবিতাটি। সে চুপ করে রইলো।

মালতী বললে, আমার যেন কয়েকটা লাইনও মনে পড়েছে। এই অসুখের পর থেকে প্রায় রোজই ফাঁকি, নিষ্কৃতি এই সবগুলো যে খুব পড়েছি।

বিলাসপুরের ইষ্টেশনে বদল হবে গাড়ি ;
তাড়াতাড়ি
নামতে হল। ছ' ঘণ্টা কাল থাকতে হবে যাত্রীশালায়।
মনে হল, এ এক বিষম বালাই।
বিনু বললে, কেন, এই তো বেশ।
তার মনে আজ নেই যে খুশির শেষ।

আরও কত সব মনে পড়েছে। মনে পড়েছে বিনু আর ফেরেনি।

তুমি বড্ড বেশী উতলা হয়ে পড়েছো মালতী। ফাঁকি কবিতার কথা কিন্তু তা নয়, বিনুর স্বামীর বেদনাই ওখানে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। বিনুর ফেরা না ফেরাটা বক্তব্য নয়।

মালতী বললে, কিন্তু বিনু আর ফেরে নি।

বিনুর ঘটনাটা কবির কল্পনা, তখন যক্ষ্মা থেকে রক্ষা ছিল না, যক্ষ্মা মানেই জন্মান্তর। আর আজ যক্ষ্মায় মরাই হচ্ছে আশ্চর্যের ব্যাপার। বসন্ত বললে।

পেণ্ড্রা রোডের স্বাস্থ্যনিবাসে এসে মেজর দত্তের সংগে কথাবার্তা বলে মালতীরও বিশ্বাস হলো যক্ষ্মায় আজকাল আর কেউ মরে না, সে-ও মরবে না।

স্যানাটোরিয়াম সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। এমন সুন্দর আলো বাতাসওয়ালা ঘরে রোগীকে থাকতে দেওয়া হয়! এই রকম ফাঁকা মাঠ, ফুলের বাগান। মেয়েদের জন্যে ভিন্ন ব্যবস্থা। পুরুষদের জন্যে আলাদা ওয়ার্ড। স্বর্গের সৌন্দর্য বিরাজ করছে যেন এখানে।

মেজর দত্ত বসন্তকে নিশ্চিত আশ্বাস দিতে পারলেন না। তবুও তিনি বললেন, ভয়ের তেমন কিছু নেই। মাস কয়েকের মধ্যেই বোঝা যাবে, কেমন দাঁড়াবে। মনে হয়, সেরে উঠবে। আপনারই স্ত্রী?

অপরাধীর মত বসন্ত স্বীকার করলে, হ্যাঁ।

মেজর দত্ত বললেন, আগে থেকেই একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল। সামান্য জ্বর যখনই হতো, কিম্বা কাসির গোড়ার দিকে একটু নজর দেওয়া হলে, রোগটা আর এতদূর গড়াতো না। বাঙালী জাতেরই দোষ; আপনাকে আর বেশী কি বলবো, বলুন?

বসন্তের ভাগ্যে এ তিরস্কার জুটলেও এ জন্যে তার কিছু করণীয় ছিল না। বিয়ের সংগে সংগে মালতীর রোগ প্রকাশ পেয়েছে বটে, কিন্তু জমি তৈরী আগে থেকেই ছিল। সে কথা বিস্তারিতভাবে আর তুলে লাভ কি?

একটু দূরে বসবাসের প্রায় অযোগ্য একটা হোটেলে উঠতে হলো বসন্তকে। মালতী ভর্তি হলো স্যানাটোরিয়ামে। সাতটা দিনের ছুটি নিয়ে বসন্ত এসেছিল, কিন্তু দেখতে দেখতে তাও শেষ হয়ে এল। এবার বিদায়ের পালা।

বসন্ত বললে, অবুঝ হয়ো না। আমি ছুটি পেলেই আবার আসবো। এখানে তোমার কোন অসুবিধে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করে গেলাম। মাসে মাসে ওখান থেকে টাকা পাঠাবো। তোমার কোন ভাবনাও থাকবে না।

মালতী বললে, আর বোধ হয় আমাদের দেখা হবে না।

কেন? আমি ত' ক'মাস পরেই ফের এসে তোমাকে নিয়ে যাবো। এ কথা কেন বলছো?

মালতী কিছু বললে না, শুধু তার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালে, ফ্যাকাশে চোখের দু' কোণে দু' এক ফোঁটা জল চিক্ চিক্ করছিল শুধু।

বসন্ত কোলকাতায় ফিরে এল। একেবারে ফাঁকা। বিসর্জিত প্রতিমা যেন দশমী দিবসে—এই রকম মনের অবস্থা! সাধ্যের অতীত চিকিৎসার পথ নেওয়া হয়েছে। সেদিক থেকে অবশ্যই মনের সান্ত্বনা আছে। কিন্তু তাতেও যদি না সারে?

সেকথা ভাবতেও 'বসন্ত শিউরে ওঠে। আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, সে এক জায়গায় কোথাও বাঁধা পড়বার জন্যে আসেনি বলেই বুঝি মালতীকে তার কাছ থেকে চলে যেতে হবে।

কোলকাতায় ফিরে এসে ফাঁকা ঘরে মন টেঁকে না। সন্ধ্যেয় ঘরে ফিরে এলে মনে পড়ে মালতী বুঝি শয্যার সংগে মিশে গিয়ে শুয়ে আছে। তার কাসির খক্ খক্ আওয়াজটুকু পর্যন্ত দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বসন্ত যেন শুনতে পায়, চম্‌কে ওঠে। এ ঘরটা তাকে ছাড়তেই হবে। মালতীর এই স্মৃতি নিয়ে সে বাস করতে পারবে না এখানে। এই জানালার পাশে বিকেলে মালতী খাটের এক কোণায় উঠে বসতো। এক ফালি আকাশ দেখা যায় সেখান দিয়ে। সেদিকে তাকাতো, এই কাপে করে চা খেত, ওই গেলাসটা মালতীর জন্যে আলাদা করা ছিল। তাছাড়া এ ঘরটা বসন্তের স্বাস্থ্যের দিক থেকেও বাসের পক্ষে অনুকূল নয়। অতএব তাকে বাসা বদল করতেই হবে।

প্রায় প্রতিদিনই মালতীর চিঠি আসতে আরম্ভ করলো। বসন্ত সাত দিনে একটি দীর্ঘ পত্রে উত্তরের কাজ সেরে দেয়। মালতীর দিন কাটে ত' রাত কাটে না। সময় যে হাতে কত ভারী ঠেকে, তা এইরকম অসুস্থ হয়ে এইরকম বিলাসলালিত স্বাস্থ্য নিবাসে না এলে

বোঝা যায় না। এর মধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনেক বই—যা তাকে প্রথমে দেওয়া হয়েছে, পড়ে শেষ করে ফেলেছে। গল্পের বইও পড়ে, উপন্যাসও পড়ে। আর চিঠি লিখতে হয় রোজ, নইলে দিন কাটে না। বসন্তই মালতীর একক আত্মীয়,—তাই পত্রাঘাতটা তাকেই শুধু সহ্য করতে হয়। ছোট বোন্‌টা সেই বর্মায় গেছে আর কোন খবর পর্যন্ত দেয়নি।

মালতীর চিঠি লেখার ধারা ও তার বিন্যাস দেখে বসন্তের আনন্দ হয়; মালতী শেষকালে না লেখিকা হয়ে ওঠে। তুচ্ছ কথাকে কেমন কথাগুচ্ছে রূপ দিতে পারে! মালতীর তুলনায় তার নিজের চিঠি কত হীন মনে হয়। অবশ্য সেটাই বসন্তের একটা অজুহাত—তোমার মতো চিঠিকে সরস করে রচনা করতে পারি না বলেই পত্র দিতে এই কুণ্ঠা।

মালতী চিঠি পড়ে। বার বার পড়ে, আর একটু হাসে; নিজের চিঠি লেখার তারিফে মনটা খুসিতে ভরপুর হয়ে ওঠে। তৎক্ষণাৎ জবাব লিখতে বসে যায়, কতদিন দেখিনি তোমায়, যেন এক যুগ। আচ্ছা, তুমি ত' বেশ লোক, আমিও অবশ্য। আসবার সময় আমাদের ফটো স্ট্যাণ্ডটা আনা হয়নি। বিয়ের পরে তোলা সেই বিলেতী ফ্যান্সী স্ট্যাণ্ড। সেটা এবার নিয়ে এসো। তবু রোজ যদি চোখের সামনে তোমার সেই তখনকার সদাহাস্য ছবিটা দেখি, মন খুসিতে ভরে উঠবে; অন্ততঃ কল্পনা করে তোমাকে চোখের সামনে, মনের সামনে হাজির করার কষ্ট ত' কমবে।

এই ফটো দুটোর জন্যে প্রতি চিঠিতে তাগিদ আসতে লাগলো। বিলিতি দোকান থেকে দোকানীর কথায়, এই রকম একটা ফ্যান্সী স্ট্যাণ্ড কেনা হয়েছিল; এরকম আর পাওয়া যাবে না। বিলিতি সৌখীন জিনিস আমদানী ত' প্রায় বন্ধই হয়ে এসেছে; তাই প্রিয়জনকে উপহার দেবার জন্যে এখন নানা অসুবিধা।

দুজনের বাষ্ট ফটো তোলা হলো, সেখানে ভরাও হলো। যখন এই সংকীর্ণ অপরিসর অন্ধকার ঘর ছেড়ে বড় প্রসারিত ঘরে উঠে

যাবে—বৈঠকখানার টেবিলের ওপর কোণাকুণি বসানো থাকবে এই ফটো দুটো, দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখীর মতো।

কবে যে বসন্ত ছুটি পাবে ঠিক নেই। রেজিষ্টার্ড পার্শেলে পাঠিয়ে দেওয়াই বরং ভালো। তাই ছবির নীচে নাম খোদাই করিয়ে নিয়ে এসেছিল নিজের সই করে, আর মালতীর নাম সে লিখেছিল নিজের হাতে, তাও খোদাই করা। লেখা দুটো খেয়ালের মাথায় হলেও বড় সুন্দর আর শিল্পী সুলভ হয়েছিল বলেই খোদাই করানো হলো। বসন্ত একদিন সেটি কোন পুরনো তোরংগ থেকে বের করে তার ধুলো ঝেড়ে মুছে মোড়ক করে পাঠাবার ব্যবস্থা করলে।

ফটোর দিকে তাকালে এখনো মালতীর স্নিগ্ধ হাসির একটা স্তিমিত আভা লক্ষ্য করা যায়। এটাই মালতীর বৈশিষ্ট্য। তেমন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ গায়ের রঙ নয়, দেখতেও এমন কিছু আহা মরি নয়, তবু হাসিটুকুর স্নিগ্ধ প্রলেপে একটা আকর্ষণ আছে, মালতীর এই হাসি দেখলে তার মুখ থেকে চোখ ফেরানো দায়। ফটোতেও সেই মায়া, সেই যাদুর আশ্চর্য প্রলেপ রয়েছে। বেদনায় তার মনটা ভরে উঠলো।

মালতীরও সেই এক ভাবনা। সে ফটো পেয়ে লিখলো—তোমার মুখের দিকে চেয়ে মনটা হু হু করে উঠলো। ফটোর মধ্যেও মানুষকে এতখানি পাওয়া যায়, এর আগে তা কখনো উপলব্ধি করি নি। মনে হচ্ছে আমার চুলে যেন তুমি আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছ, মনে হচ্ছে শিয়রে বসে সান্ত্বনার কথা বলছো দুটো।

বসন্ত বাসাটা ছেড়ে দিয়ে মেসে চলে এল। মালতীদের পুরনো জিনিস, বাক্স-তোরঙ্গ, বিছানা—পুরনো কাগজ-ওয়ালাকে ডেকে বিক্রী করে দিলে। মালতীর মার স্মৃতি, তার বাবার স্মৃতি। হয়তো তাদের বংশের কত আনন্দ বেদনার স্মরণ-চিহ্ন। সব কিছু বিলিয়ে দিতে বিক্রী করে দিতে বসন্তরও কষ্ট হলো, কিন্তু একটা সংসারের লট বহর নিয়ে ত' মেসে ওঠা যায় না। মালতী যদি ফিরে আসে, নতুন করে আবার সে সংসার পাতবে।

যদি ফিরে আসে মানে? বসন্তের মনে যেন একটা কাঁটা ফুটে উঠলো। আজ আট মাস হতে চললো মালতী গেছে, স্বাস্থ্যের উন্নতি তেমন ত' হয় নি। ইতিমধ্যে ডাক্তার বদলি হয়েছে কত, সকলেই লিখেছেন, এ কেস সেরে যাবে। আগের চেয়ে অনেকটা ইম্‌প্রুভ্‌ড্‌। মালতীও তাই লিখেছে। ভয় নেই, একটু একটু করে তোমার দিকে, প্রাণের দিকে, বাঁচার দিকে ফিরছি বলে মনে হচ্ছে!

কিন্তু মালতীর পরের চিঠিতেই হয়ত হতাশার সুর বাজে। জীবনের খাতা থেকে আরো একটা দিন খরচ হয়ে গেল। নিশ্চিত মৃত্যুর কবলে আছি। এই অবস্থাটা কি কল্পনা করতে পারো?

বসন্ত লিখলে—আমাদের বিয়ের তারিখ আজ। একটা বছর পূর্ণ হলো। এই দিনে তোমাকে কাছে পাওয়ার আগ্রহ ও প্রার্থনা নিয়ে তোমার আরোগ্য কামনা করছি।

কিন্তু মালতী লিখলে দীর্ঘ এক চিঠি। বিবাহিত জীবনে স্বামীকে খুব বড় করে চিঠি লেখার শেষ সাধটুকু পূর্ণ করেই বোধ হয়।

খুব মিষ্টি প্রিয় সম্বোধন করে পাট লিখেছে মালতী, নিজের জীবনের আদ্যন্ত ফিরিস্তি না দিয়েই যে বেদনা প্রবাহের মধ্যে দিয়ে তার জীবন বয়ে চলেছে—তারই স্বল্প ইংগিত দিতে ভোলে নি। চিঠিটা পড়লে মনে হবে মালতী বোধহয় বসন্তের কোলে মাথা রেখে কাঁদতে সুরু করেছে।

কেমন করে তোমার জীবনে জড়িয়ে গেলাম আমি—সে কথা তুলে আর লাভ কি বলো? দুঃখ দুর্দশাকে কখনো গ্রাহ্য করি নি, মান্য করিনি। নিত্যকার খোরাকির মতো সহজ করে নিয়েছিলাম। এর মধ্যে এলে তুমি। তোমাকে ফাঁকি দেব তোমার মতো বঞ্চিত ভাগ্য একজন পুরুষকে ঠকানো—এমন মন আমার নয়গো। চেয়ে ছিলাম সেবা যত্নে সোহাগে শুশ্রূষায় তোমার জীবনে ফুল হয়ে ফুটবো, প্রেমিকের কাছে ফুলের যে মর্যাদা—সেই গৌরবে। কিন্তু তা হলো না। বসন্তকালে যে মালতী ফোটে না। গ্রীষ্মের উত্তাপের ফুল মালতী। তাপের সময় সে মাতে, স্নিগ্ধ দক্ষিণ বাতাসে সে থাকে

না। তোমার জীবনে বসন্তের মালতী কি করে টিঁকবে বলো। তাই এই কাল ব্যাধি।

এই রকম আরো কত কি।

ভেতরে ভেতরে বসন্তও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বিয়ের মাস চারেকের মধ্যেই এই দুর্যোগ। আজ আট মাস হলো সমানে সে এই বোঝা টেনে চলেছে। একটা মুমূর্ষু মৃত্যুপথযাত্রিনীর চিকিৎসা থেকে সুরু করে দৈনন্দিন জীবন যাত্রার নানা খুঁটিনাটির ব্যয় ভার বহন করা কম কথা নয়। তার ওপর আবার স্যানাটোরিয়ামের নিয়মের বাইরে কিছু চলবে না; যে টুথপেষ্ট ওরা বলে দেবে, যে টুথ ব্রাস যে কদিনের জন্যে বলবে, যে তোয়ালে যে সাবান এমন কি যে প্যাটার্ণের সাবানদানীটা পর্যন্ত।—ওদের নিয়মের বাইরে হলে চল্‌বে না।

বসন্ত যেন হাঁপিয়ে ওঠে, ঘাবড়ে যায়। এত করেও কি মালতীর মনে আশার একটি স্তিমিত আলো জ্বালাতে পারা গেল না। তা যদি না যায়, যদি সত্যিই অকালের বসন্তের মালতী ঝরেই যায়, বসন্ত তার কি করতে পারে? মনকে বাঁধতে হবে। বসন্ত একটু একটু করে শক্ত হয়। মালতী যদি অকালে ঝরেই পড়ে। সর্বস্বান্ত করে যাবে কেন বসন্তকে? বসন্ত অন্ততঃ সে দিকটাকে রক্ষা করতে ত' পারে। এখনও সময় আছে।

যে মেসে উঠে এল বসন্ত, সেখানকার ঠিকানা জানালো না মালতীকে। শুধু জানালা—বাসা ত্যাগ করেছে এবং পাড়ার লোকের অত্যাচারেই করতে হয়েছে, যারা মালতীর সংসার এবং পরিজনদের সহ্য করেছিল, তারাই কিন্তু মালতীর পরমাত্মীয়কে সহ্য করতে পারে নি।

মেসের ঠিকানা দেওয়া গেল না। মালতীর চিঠি নিশ্চয়ই এখানে বেহাত হয়ে যাবে। কদিন পরেই বসন্ত নিজে যাবে সেখানে; না হয়তো চিঠি পত্রের জন্যে নির্দিষ্ট একটা ডেরার হদিস দেবে।

তার পরের মাসেও বসন্ত কিন্তু টাকা ঠিক পাঠিয়ে দিলে। অভাব

নেই ঠিকই, তবু স্বচ্ছলতা এমন কিছু নেই। দেশে মা জেঠিমার কথা যে একেবারে মনে পড়ে না তা নয় ; তারা বসন্ত সম্পর্কে আর কোন কৌতূহল প্রকাশ করে না। মাঝে হরিমামার সংগে দেখা হয়েছিল ধর্মতলার মোড়ে, রসোমালাই কিনতে এসেছিলেন। হাসি বি. এ পাশ করেছে বলে সে খাওয়াতে এসেছে মিষ্টি। আর হরিমামার প্রিয় খাদ্য হলো রসোমালাই। হাসি নিজের ইচ্ছাতেই টাকা দিয়েছে। ধর্মতলা থেকে তাই খাবার কিনতে আসা, তাইতেই বসন্তের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

হাসি পাশ করেছে, শুভ খবর। হাসিই খাওয়াচ্ছে মিষ্টি আপনাদের? তবে ত' মামা, আমারও কিছু প্রাপ্য। বসন্তের স্যুট পরা চেহারা, ধোপ দুরস্ত বাহারে নেকটাই, চোখে দামী গগল্স্। হরিশরণ মামা বসন্তকে দেখে, প্রথমে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলেন। পরে জানলেন জীবনে সে দাঁড়িয়েছে কিছুটা। তারপর গার্জ্জেনগিরি করবার অদম্য ইচ্ছা প্রকাশ করে বললেন, গাধা, একটা খোঁজ খবরও ত' দিতে হয়, কোথায় আছিস, কি করছিস। এর মধ্যে তোর মা এলো, চলেও গেল। দেখা হলো না তোর সংগে।

মা কবে এসেছিল? জ্যেঠিমাও এসেছিলেন? পিসিমা?

না রে। শুধু তোর মা এসেছিল। ওরা দু'জন ত' আর বেঁচে নেই। তোর পিসিমা গেল কলেরায়। আর জ্যেঠিমা যেন কিসে।

বসন্ত নির্বাক বেদনায় হরিশরণ মামার কথাগুলো গিলছিল যেন।

মা এল, অথচ একটা খবর পেলাম না?

তোর মা এসেছিল, তোর বিয়ে দিতে। মেয়ে পক্ষই পাকিস্থান থেকে কোন রকমে আনে কোলকাতায়। ছেলের সংগে বিয়ে দিতে হবে এই সর্তে ; কিন্তু তোর ত' ঠিকানা জানি না। তোর অভাবের সময় ছিলি আমার কাছে। এখন হাজার হোক, দু পয়সা আনছিস, ছেঁড়া ধুতি ছেড়ে কোট প্যাণ্ট পরছিস, অবস্থা ফিরেছে, এখন আর গরীব মামাকে মনে রাখবি কেন? ঠিকানা ত' না দেওয়াই উচিত। এ তুই কেন, দুনিয়া ভর এই আমি দেখে আসছি।

মা কি আবার ফিরে গেল। না এখনো আছে? কতদিন আগের কথা?

তা ছ'মাস ত' হবেই। তোর গজুদা, ভজুদা, কোথাও বাকী রাখিনি খুঁজতে। আমাকে সব খুলেই বললে গজানন, "তুই নাকি এক নামকরা থিয়েটারউলীকে বিয়ে করে তার ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছিস। এই কথা না শুনে তোর মা ত' গেল অজ্ঞান হয়ে। কোলকাতার এমন ধারা কাণ্ডকারখানা তার জানার কথা নয়। খরচের বরাত করে এসেছি। করে যাবো সকলের। তোর করেছি, তোর মা'র সেবা করবো না। ডাক্তার আর ঘর করে তবে তাকে সুস্থ করি। সেরে উঠেই বলে কিনা তীর্থে যাবো। আগে ত' কেদার-বদরি যাবার জন্যে বায়না, পরে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মথুরা বৃন্দাবন পাঠানো গেল। এখন বৃন্দাবনেই আছে, ওখানে ত' বাঙালি বিধবাদেরই আড্ডা।

বসন্ত কিছু না বলে মার ঠিকানাটা শুধু চেয়ে ছিল, কিন্তু হরিমামা আর তার কোন খোঁজ রাখেন না। নিজের কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে, সংসার নিয়ে জ্বলে পুড়ে মরছেন। পরকালের কাজ অবধি করতে পারছেন না, তার উপর বাইরের আবর্জনা এবং পরগাছার ভার বয়ে বেড়ানোর মতো বোকামি তাঁর নেই। স্পষ্ট করে একথা তিনি বসন্তকে শোনাতে কুণ্ঠিত বোধ করলেন না।

বসন্ত নিজের কাজে চলে গেল। হাসির পাশ করার মিষ্টি আর তার খাওয়া হলো না, মনে হলো রসোমালাই যেন এক তেতো খাবার।

বহুদিন পরে এক সন্ধ্যায় বসন্ত আবার নেশায় মত্ত হয়ে পড়লো। পুরনো এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো বলে, অথবা মালতীর আর চিঠি না পেয়ে কিম্বা মার জন্যে মনটা কেঁদে উঠলো কিনা, তা বলা মুস্কিল। নৈরাশ্যের বেদনার একটা মিশ্রিত হাহাকারের তীব্রতা থেকে মুক্তির জন্যেই বন্ধুকে টেনে নিয়ে গিয়ে গলাটা একটু ভেজালে।

মালতীর গা ছুঁয়ে বসন্ত প্রতিজ্ঞা করেছিল, মদ আর মোদক সে ছেড়ে দেবে। কিসের প্রতিজ্ঞা? মেয়েরা পুরুষের জীবনের বেদনার স্বরূপ কি বুঝতে পারে? নিজেদের মেয়ে-জীবনের পরিবেশের মধ্যে পুরুষকে বাঁধতে পারলেই মেয়েদের হলো! তা ছাড়া মালতী ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে তার জীবন থেকে। শুধু অতীতের শাসনের ক্ষীণ একটা প্রভাব কিম্বা তার ছায়ার ভারে বসন্ত নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দেবে কেন?

একদিন বৃন্দাবনেও সে গেল মায়ের খোঁজে। ভারি আশ্চর্য ঠেকে তার। মধ্য বয়সে সে তার বুড়ি মাকে খুঁজতে যাচ্ছে তীর্থে, ঠিকানা না জেনেই। মার প্রতি সে কর্তব্য করে নি। মামার প্রতি কর্তব্য পালনের প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু জেঠিমা পিসিমা যে চলে গেল অকালে, তাদের জন্যে এক ফোঁটা চোখের জল সে ফেললো না অথচ সেই ত' একমাত্র বংশধর। মালতীর জন্যেই এমন হয়েছে। মালতীর সংগে দেখা হওয়া থেকে সুরু করে মালতীদের বাসা ছেড়ে মেসে আসা পর্যন্ত ঘটনা প্রবাহ এমন দ্রুত বয়ে গেছে বসন্তের জীবনে, সাহিত্যের ভাষায় যাকে জীবনের ঝড় বলে, বসন্ত একটুও দম ফেলবার সময় পায়নি। নেশাই করেনি সে কতদিন। থিয়েটারের দল নিয়ে গজানন উত্তর কোলকাতায় উঠে গেছে বলে ওদের আড্ডায়ও সে যেতে পারেনি।

হাসির কথা মনে হয় নি কখনো। আর এত শিক্ষিত মেয়ে যে হাসি, তাও সে স্বপ্নে ভাবে নি। মার কথা মনেও ওঠেনি। আজ একটু ব্যথা জাগছে। মা তাকে কত কষ্ট করে মানুষ করেছে, তাকে মানুষ হবার জন্যে কোলকাতায় পাঠিয়েছে, এমনকি তার কল্যাণের জন্যে তুলসীতলায় মাথা ঠুকে ঠুকে কপালে কালসিটে ফেলেছে।

বৃন্দাবনে সে আর কখনো যায় নি; নতুন একটা জায়গা বেড়ানোর আনন্দও ত' আছে। দিল্লী, আগ্রা বেড়িয়ে সে মথুরায় গেল। যখন এদিকটায় এসেই পড়লো, একবার এই সব বিখ্যাত

ইতিহাস প্রসিদ্ধ জায়গাগুলো না বেড়িয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না।

বেশ কিছু টাকা খরচ করার পর বসন্ত বৃন্দাবনে এল। কিন্তু কোথায় তার মা? এখানে সেখানে—এ মধুবন, ও কুঞ্জবন, এ ঘাট ও পুলিন—সোনার তালগাছ, সোনার গৌরাংগ, এ মন্দির, সে মন্দির কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। ভিখিরীর দলের মধ্যে বসে কেষ্ট নাম করছে—একমুঠো অন্নের বিনিময়ে? না, না, তা কি সম্ভব? তবু সে সব অঞ্চলে ভিক্ষুক বিধবাদের দলের দিকে চোখ রেখে ফিরে ফিরে ব্যর্থ হলো।

শুধু টাকা খরচই সার হলো। হঠাৎ মনে পড়লো এ মাসে মালতীর টাকা ত' পাঠানো হয় নি। সেকি! সত্যিই ত'! অসুস্থ রোগপাণ্ডুর বেদনা-মলিন মুখে প্রত্যাশার এক আলো জ্বেলে মালতী দিন গুণছে। কবে তার নামে টাকা জমা পড়বে। টাকা না দিলে যে তাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে তাড়িয়ে দেবে।

পকেট হাতড়ে দেখা গেল, বেশী টাকাও নেই, শ' খানেক কি তার কিছু বেশী হবে। এ টাকা পাঠানো যায় না, তাকে ত' ফিরতে হবে কোলকাতায়। আর এই টাকাটা নিতান্ত সামান্যও।

বসন্তের মনটা ভারি ব্যাকুল হয়ে উঠলো। গোড়ার দিকে টাকা পাঠানোর কথা স্মরণ হয়েছিল। শুধু মাত্র বৃন্দাবনেই যাবে, সপ্তাহ খানেক পরে ফিরে এসে টাকা পাঠাবে এই সংকল্প ছিল। এই ক'দিন দেরীর জন্যে আর কি হবে? কিন্তু বাইরে বের হলে সব ভণ্ডুল হয়ে যায়। বসন্তের মধ্যে একটা ভবঘুরে বাউণ্ডুলে ভাব আছে। সেই তাকে কর্তব্য-বিচ্যুত করেছে, এখন আবার এই অবহেলার জন্যে চাবুক চালাচ্ছে রূঢ় হাতে নির্দয়ভাবে।

হাজার চেষ্টা করেও মালতীর টাকা পাঠানো গেল না। একমাস পিছিয়ে গেলো। আর একবার যদি দেরী হয়, এবং এই দেরী যদি গা-সওয়া হয়ে যায়,—তাহলে যা ঘটে। ধীরে ধীরে বসন্ত অমনোযোগী হয়ে পড়লো।

এক একবার যুক্তি দেয় নিজের কাছে। কি এমন চুরির দায়ে ধরা পড়েছে সে! রেজিষ্ট্রী ম্যারেজে দায়িত্ব ত' উভয় পক্ষের। সে কেন একা এই ক্ষতির খেসারত দেবে? টাকা প্রতি মাসে ত' সে কম দেয় নি। পুরো আট মাস পাঠিয়েছে, একটা দিনও দেরী করে নি! এই দু' তিন মাস এদিক ওদিক হয়েছে। দু' মাসের বোধ হয় বাকী পড়েছে। চার মাস মাত্র তার বিবাহিত-জীবন। এক বছর তার জের।

মহুয়ার রঙ ধরে, পলাশের নেশা জাগে। বসন্তের দাক্ষিণ্যের দিকে তাকিয়ে মালতী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। অনেকটা সে সেরে উঠেছে। কিন্তু বসন্তের কি হলো—কোন খবর নেই কেন? অফিসের নামটা জানা ছিল কিন্তু কোন্ ডিপার্টমেণ্টে সে চাকরী করে, আর সেই ডিপার্টমেণ্টের কোনো হদিস জানা নেই মালতীর।

ডাক্তারেরা বলেন, আপনার রোগ সারার পথে। একটা লাংস ত' সেরেই গেছে। আর একটাও সেরে এসেছে। কিন্তু এ সময় এমন উদ্বিগ্ন হলে ত' চলবে না। উতলা হন কেন? মনের আনন্দ এই রোগের একটা বড় ওষুধ—তা জানেন?

মালতী সবই জানে, কিছু বলতে পারে না।

একদিন হোস্টেলের ইনচার্জ এসে জানালেন, এ মাসের টাকা জমা পড়ে নি আপনার নামে। এতে হোস্টেলের ডিসিপ্লিন নষ্ট হয়; প্রয়োজনের টাকা সময়মত ঠিক না এলে কাজেরও নানা অসুবিধে হয়।

সাতদিন পরে আবার তাগাদা এল। মালতী তার ঝি ঝুমনিকে দিয়ে নিজের হাতের কয়েক গাছা চুড়ি আর দুটো আংটি বিক্রি করে কিছু টাকা জমা করে দিলে।

পরের মাসে টাকা এলো, কিন্তু তাও দেরীতে। তার পরের মাসের টাকা যেন আর আসেই না!

দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে মালতীর মুখে স্বাস্থ্যের লাবণ্য নিভে গেল।

ডাক্তারবাবু ধমক দিলেন। বললেন, আর ক'দিনেই ছুটি পেতে পারেন। আপনি এখন মোটামুটি সুস্থ। কিন্তু খুব সাবধানে থাকবেন।

অসাবধানে থাকবার ত' কোন প্রশ্নই ওঠে না ডাক্তারবাবু। বেদনার্ত কণ্ঠে মালতী বললে।

আপনাকে যেন সবসময়ে বিশেষ চিন্তিত বলে মনে হয়।

মালতী একটু দম নিয়ে বলতে লাগলো, শুনেছি তিন মাসের টাকা বাকী পড়েছে হাসপাতালে। আমার স্বামী আর টাকা পাঠান না। কি হয়েছে তাঁর, তাও জানি না, চিঠিও পাই না ; চিঠি লিখেও উত্তর পাই নি। কোলকাতায় আমার কোন আত্মীয় স্বজনও নেই যে তাদের কাছ থেকেও ওঁর খবর নেব। কি জানি কি হয়েছে তাঁর ; আজকালকার পথে ঘাটে যে কতরকম য়্যাক্‌সিডেণ্ট হয়, আর কোলকাতায় ত' নানা রকম এপিডেমিক লেগেই আছে। আমার মন বড় অস্থির হয়ে পড়েছে নানা কারণে।

মালতী কেঁদে ফেললে, বেদনায় তার গলা ধরে গেল।

আমরাও ওই রকম কিছু সন্দেহ করেছিলাম, কিন্তু ব্যাপারটা বোধ হয় তা নয়।

মালতী একটু কৌতূহল, একটু আগ্রহ নিয়ে অধীরভাবে তাকালো ডাক্তারবাবুর দিকে।

আপনি যার পেসেণ্ট হয়ে এখানে ঢুকেছিলেন, সেই মেজর দত্তের সংগে নাকি একদিন বসন্তবাবুর দেখা হয়েছিল কোলকাতায়।

মালতী অধীর আগ্রহে কথাগুলো গেলবার ভঙ্গিতে উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

আমরা আপনার চার্জেস্ সম্পর্কে ভাবিত হয়েছিলাম। তখন আমাদেরই এক বন্ধু—আপনি বোধ হয় চিনবেনও, ডাঃ ট্যাণ্ডন, পুরুষদের বি, ব্লকের ইনচার্জ ; তিনি একটি মেডিক্যাল কনফারেন্সে যোগ দিতে কোলকাতায় যান। সেখানে মেজর দত্তের সংগে তাঁর দেখা হয়। তিনিই বলে পাঠিয়েছেন। বসন্ত তার রোগীর সমস্ত দায়িত্ব

ত্যাগ করেছে। মিথ্যে সে এক দায় বইতে পারবে না। পেসেণ্টকে ফ্রি বেডে রাখা সম্ভব না হলে ছেড়ে দিতে পারেন, যা ইচ্ছে করতে পারেন, তার কোনও বক্তব্য নেই। মেজর দত্তের অনুরোধ অনুযায়ীই কোন রকমে আপনাকে একটু দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমরা ছুটি করিয়ে দেব আপনাকে, এই রকম ভাবছি।

একি শুনছে মালতী? বসন্ত তাকে ত্যাগ করেছে। মৃত্যুর কোলে যার আশ্রয় মিললো না, জীবনের পরপারের দরজা থেকে ফিরিয়ে আনা হলো যাকে, তাকে বসন্ত কি করে ছুঁড়ে ফেলে দিল? বসন্ত তাহলে তাকে মৃতই ধরে নিয়েছে। খরচের খাতায় যে, তার জন্যে আর এত ব্যয় কেন? মদ্যপ মোদকখোর রাঙাচোখ বসন্তের রুক্ষ মূর্তিটা মালতীর চোখের ওপর ভেসে উঠলো। এই রকম নেশা করা চেহারায় একবারই সে দেখেছিল বসন্তকে। ঘৃণায় মালতীর সমস্ত মন বিরূপ হয়ে উঠলো।

গলায় একছড়া হার ছাড়া তার দেহে আর কোন অলংকার নেই। কি করে সে এখানের দেনা শোধ করবে? কি করে আবার এই ভাঙা স্বাস্থ্য নিয়ে জীবনের ফেলে আসা সূত্রটুকু জুড়ে দেবে?

বসন্ত বেইমান! মালতী কি করে ভাববে একথা! বিয়ের পর চারমাসে মানুষটাকে এতটুকু শান্তি দিতে সে পারে নি। কিন্তু এই আট দশ মাস নীরবে ত' সে রোগের সকল ব্যয়ভার বহন করেছে, দায়িত্বের জোয়াল কাঁধে নিয়েছে। হয়তো সত্যিই সে মালতীকে মৃত্যুপথ-যাত্রিনী ভেবে মনকে শক্ত করে বেঁধেছে, শেষ ক'রে দিয়েছে সম্পর্ক, অস্বীকার করেছে রেজিষ্ট্রি অফিসের কয়েকটা কথা। তাহলে মালতীর কি বা করবার আছে? বরং যেটুকু করেছে বসন্ত, পথের আলাপী, পথের মানুষ, মনের মানুষের চেহারায় ধরা দিয়েছে, সেটুকুই যথেষ্ট। এজন্যে বরং সে কৃতজ্ঞতার পাত্র, তাকে বেইমান ভাববার কোন কারণ নেই। তবু আদর্শহীন ভবঘুরে মোদক খাওয়া বসন্তের প্রতি তার একটা অশ্রদ্ধা জেগে ওঠে।

আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? মালতীর হঠাৎ মনে পড়ে

গেল, তাদের বাড়ির ঠিকানায় পাশের ঘরের রাঙাবউকে একটা চিঠি লিখলে হয়। রাঙাবউ তার বন্ধু, আর সে যে ঐ বাড়ী ছেড়ে কোন দিন উঠে যাবে এমন নয়। বসন্তের খবরটা তার পাকাপাকি পাওয়া দরকার।

রাঙাবউ উত্তর লিখলে বেশ কায়দা করে। প্রথমেই জানিয়েছে, মালতী যে বেঁচে আছে, তাতে তারা সকলেই খুসি হয়েছে, খুব খুসি হয়েছে। প্রথমে তো বিশ্বাস করতেই পারে না যে এ মালতীর হাতের লেখা! বসন্ত চলে গেছে অন্য কোথাও। যাবার সময় কিন্তু বলে গেছে, মালতী সকলের মায়া কাটিয়েছে। স্পষ্ট বলে নি বটে—মালতী মরেছে, তার হাড় জুড়িয়েছে। বসন্তকে মালতীর কথা জিজ্ঞাসা করা হলে বলেছে, বুঝতেই পারছো, যখন সংসারের পাট চুকিয়ে দিলাম; থালা ঘটি পর্যন্ত বিক্রী করে দিয়ে চলে যাচ্ছি—তখন কি আর মালতীর খবর বুঝতে বাকী থাকে? বিষণ্ণ হয়ে বোধ হয় দু' ফোঁটা চোখের জলও ফেলে থাকবে বসন্ত, সেকথা আজ আর রাঙাবউ'এর মনে থাকবার কথা নয়। তা এখন মালতী সুখে থাকুক, এটুকুই সে কামনা করে।

বসন্ত ভীরু, পলাতক, পরাজিত সৈনিকের মতো আত্মসংগোপনশীল। কিন্তু সে মালতীর সেরে ওঠার খবর নিয়ে সুস্থচৈতন্য ভদ্রমানুষের মতো ঋজু মেরুদণ্ডবান লোকের মতো বিদায় নিলে না কেন?

ঝুমনিকে ডাকলো মালতী। গলার হারটাই তার শেষ সম্বল। যদিও এই হারের বিনিময়ে যে ক'টি টাকা মিলবে তাতে স্যানাটোরিয়ামের টাকা চুকিয়ে দেওয়া যাবে। নিজের স্বাস্থ্যের পেছনে না হয় আর কিছু করার দরকার নেই, কিন্তু কোলকাতায় ফেরার গাড়ীভাড়া চাই, সেখানে গিয়ে কোথাও উঠতে হবে—কিছু খরচপাতি করতে হবে ত'।

একটা উজ্জ্বল রৌদ্রস্নাত সকালকে কেমন নিস্তেজ ম্লান মনে হতে লাগলো মালতীর। জীবনে আঘাত এসেছে অনেক, বিপর্যয় ঘটেছে বহু কিন্তু নিজেকে এমন হাল্কা মনে হয়নি কখনো।

ধীরে ধীরে আবার একটা জীবন সে গড়ে তুলতে কি পারবে ? পারা যে তার পক্ষে একান্ত দুরূহ।

জীবনের আদ্যন্ত বিশ্লেষণ করতে বসলে তার মাথা ঘুরে যায়। দুঃখ কষ্ট জীবনে সে কম করেনি. অবস্থা বিপর্যয়ের সংগে প্রতিনিয়তই তাকে বোঝাপড়া করতে হয়েছে। তবু যখন তার ব্যাধিটা আপাততঃ সেরে এসেছে বলে মনে হলো, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে সে যখন শুনলে, আবার তার জীবনের আকাশে আলো, গান জেগে উঠবে, যখন এই আশ্বাসের হাতছানি তাকে চকিত করে তুলেছিল, ঠিক সেই সময় একি বিপর্যয় ! আবার এ কোন নতুন দুর্যোগ !

বসন্ত তার জন্যে যথেষ্ট করেছে। তার ছোট বোনের বিয়ের ব্যাপার থেকে তার বাবার চিকিৎসা করা, তাকে স্ত্রী বলে স্বীকার করে একটা উজ্জল গৌরবদীপ্ত সামাজিক মর্যাদা পর্যন্ত দিতে সে কৃপণতা করে নি, কিন্তু তার বিনিময়ে কি দিয়েছে মালতী ? রুগ্ন অসহায় হয়ে সে বসন্তের ওপর নির্ভর করেই এখানে জীবনের সন্ধানে এসে উঠেছে।

বসন্তের অর্থের পেছনে এমন একটা অগৌরব থাকতে পারে— তা ত' সে কল্পনাও করতে পারেনি। স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর দাবীই প্রথম। কিন্তু বসন্তকে সেই স্বামীত্বের মর্যাদাই মানুষ করে তোলে নি। বখাটে নেশাখোর বসন্তের জীবন সম্পর্কে, জীবনের সৌন্দর্য ও রুচি সম্পর্কে কোনো স্থির প্রত্যয় নেই—তাই মালতীর কাছ থেকে বোধ হয় সে নগদ কিছু চেয়েছিল। হাতে হাতে সে স্বামীত্বের অধিকার বুঝে নেবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। পীড়িত স্ত্রীর জন্যে তাই অনির্দিষ্ট সময় ধরে শুধু খরচ করে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করে নি।

যদি বসন্তের মনে কোনো বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে থাকবে, কেন সে স্পষ্ট একটা বোঝাপড়ায় এল না। সহজ স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে একটা সমাধান নিশ্চিত হতো। মুক্তি যদি বসন্তের কাম্য ছিল, এই রুগ্ন মেয়েটার ভার যদি তার সত্যিই অসহ্য হয়ে পড়তো, বসন্তকে সে

হাসিমুখেই ছেড়ে দিতে পারতো। বিয়ের পর থেকেই এক রকম মালতীর অসুখ। বসন্তের জীবনও শূন্য। মালতী সেই রিক্ততার বেদনা দূর করে পূর্ণ হয়ে উঠবে ; এই কামনা নিয়েই সে সংসার পেতেছিল। কিন্তু তা সম্ভব হলো না। বসন্ত তারপর থেকে আদর্শ পুরুষের মতো মালতীর সেবা যত্নে মৃত্যুর মুখ থেকে তাকে ফিরিয়ে এনেছে, কিন্তু শেষের পর্বে সে হাঁফিয়ে উঠেছে। মালতী কি তার জীবনে শুকিয়ে গেল ভেবেছে !

মেজর দত্তের অনুরোধে কিনা জানা গেল না, স্যানাটোরিয়ামের ডাক্তারদের চেষ্টাতেই এখানকার সরকারী হাসপাতালে ফিমেল ওয়ার্ডে যৎসামান্য একটা চাকরি মিললো মালতীর। ডাক্তারেরা বললেন,—এই কাজে ঢুকুন প্রথমে তারপর একটু পড়াশুনো করে জুনিয়র নার্সিংটা পাশ করে নিলে, একটা ভালো চান্স পেতে পারেন। নার্সিংএর কাজে আজকাল সম্মানও আছে, টাকাও আছে, আর একটা পেট আপনার, যথেষ্ট চলে যাবে।

থাকার ব্যবস্থাও ভাল হলো, ওখানেই নার্সদের মেসে একটা সীট জুটলো।

আবার নতুন জীবন।

মালতী যেন চমকে উঠলো। কিন্তু উপায় কি। তিলে তিলে আত্মহত্যা করা এ দেশের আইনে চলে, কিন্তু বাহ্যতঃ আত্মহত্যা শুধু পাপ নয়, নিয়মেরও বাইরে।

নার্স কোয়ার্টারে নানা প্রদেশের মেয়ের ভীড়। বাঙালী মেয়েও আছে দুচারটি। টুলু, মনীষা, মাধবী, প্রীতি। মালতী দুদিনেই তাদের মধ্যমণি হয়ে উঠলো। মনীষা আর প্রীতির চেষ্টাতেই মাত্র এক মাসের মধ্যে মালতী আন্ ট্রেন্ড্ নার্স হয়ে গেল। তিন মাসের মধ্যে পরীক্ষা দিয়ে পাশও করে নিলে।

জীবনের এ এক নতুন আস্বাদ। শিফ্ট ডিউটি। সকালে,

দুপুরে, রাত্রে, যে কোন দিন যে কোন শিফ্‌টে কাজ পড়ে না। একটা নিয়মের ধারা মেনে চলা হয়। রোগীদের সেবার মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার অবাধ স্বাধীনতা। এ জগৎ মালতীর অজানা ছিল। নিজের জীবনকে সে ভালবেসেছিল এতদিন, নিজের ছোট্ট জীবনের গণ্ডীর চারপাশের মানুষজনকেই সে ভালবেসেছিল, কিন্তু পরকে নিজের চেয়েও বড় ভাবেনি কখনো, স্বার্থকে ঘিরেই ছিল তার ভালবাসা। কিন্তু এখন নিঃস্বার্থ ভাবেই পরকে ভালবাসতে শিখেছে। এ যেন ভালবাসার জন্যেই ভালবাসা।

টুলুর সংগেই মালতীর ভাবটা জমে উঠলো বেশী। মেসের একই ঘরে ছিল কিছু দিন,—আর সেখান থেকে টুলু চলে এসে কাছাকাছি নিজে আলাদা বাসা করার পর থেকে মালতীও টুলুর বাসাতে নিচের ছোট একটা ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। ছোট মধ্যবয়সী নার্সদের কল-কোলাহলে মাঝে মাঝে মালতী হাঁফিয়ে ওঠে। বড় রকমের ধাক্কা ওদের কেউ পায় নি, জীবনকে ওরা সহজ দৃষ্টি দিয়ে এখনো দেখতে পারে, জীবন সম্পর্কে এখনো সহজ প্রত্যয় ওদের মনকে মাতিয়ে রাখে।

সম্প্রতি টুলু সংসার পেতেছে,—প্রায় প্রৌঢ় ভদ্রলোক এক রোগীর সংগে প্রীতির একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তারপর রোগমুক্তি হলে বিয়ে হয় দু'জনের। মালতীর এখানে আসার পরেই অবশ্য বিয়েটা হয়, কিন্তু সে নিষেধ করেনি, নিষেধ করা চলে না বলে নয়, নিষেধ করার সম্পর্ক তখনো পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি বলে।

ধীরে ধীরে যখন লাভ ম্যারেজের ওপর আস্থা হারিয়ে যাচ্ছিল মালতীর, ঠিক তখনই টুলুর এই বিয়ে হলো।

তার বিয়ে হয়েছে কিনা—কখনো কেউ তাকে এ প্রশ্ন করেনি। মালতীও এয়োতির চিহ্ন মুছে দিয়েছে। যে মানুষটা তার প্রতি সবচেয়ে তীব্র নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছে—তাকে স্বীকার করে স্মরণ করে প্রভুত্ব ঘোষণা করার মূঢ়তা তার নেই।

টুলু মাঝে মাঝে তাকে নিঁয়ে রংগ রসিকতা করে, নতুন প্রেমের

উচ্ছ্বাসে উতলে ওঠে সে, গ্রীষ্মদগ্ধ গাছপালা যেমন নতুন বর্ষার প্লাবনে সতেজ হয়ে নিজেদের বিস্মৃত হয়—টুলুও কতকটা সেই রকমের উচ্ছলতা বোধ করে। মালতীর একটা কিছু গতি যদি হয়—তাহলে তারও আনন্দ হবে কম নয়—এদিক থেকেই সে বার বার কথাটা পাড়ে।

মালতী ছুটির দিনে টুলুর সাজগোজ দেখে। স্বামীকে নিয়ে সামান্য দূরে আউটিং-এ যাওয়ার মেজাজে টুলুর খুসি যেন স্পষ্ট ছোঁয়া যায়। সরু চিরুণীর ডগা দিয়ে সিঁথিতে একরত্তি সিঁদুর আঁকে, পোষাক পরিচ্ছদের এমন অভিনব সজ্জা ঘটায়—যাতে পিন আঁটা কালো পাড় শাড়ী পরা আট ঘণ্টা শুশ্রূষাকারিণী টুলুকে চেনাই যায় না।

কপালে সিঁদূর আঁকা নিয়ে কথা ওঠে। প্রীতি বয়স্ক মেয়ে, বিধবা। বহুদিন এসব পাট তার চুকে গেছে। তবু আজকাল মেয়েরা সিঁদূরে তেমন আস্থাবতী নয়—তা বলতে ছাড়ে না। মাধবী মনীষাও সে কথায় যোগ দেয়। টুলু অবশ্য সিঁদূর আঁকার তেমন কোনো যুক্তি খুঁজে পায় না। মালতীর মতও জানতে চাওয়া হয়। মালতী শুধু বলে—সিঁথিতে সিঁদূর দেওয়া ত' পত্রলেখা রচনা নয়, তাই ওসব বালাই এখন চুকে গেছে।

'পত্রলেখা' কি ? চিঠি লেখা—প্রিয়জনকে ? মনীষা প্রশ্ন করে।

পত্রলেখা হচ্ছে প্রিয়জনের স্মরণে প্রিয়জনের চিহ্ন অংকিত করে রাখা—বুকে, মুখে, প্রিয়-বিরহের কষ্ট দূর করার জন্যে। মালতী ম্লান হাসির সংগে সংক্ষেপে পত্রলেখার মানে বোঝাবার চেষ্টা করে।

মালতীর সিঁথিতেও সিঁদূর ছিল একদিন, দেহে পত্রলেখাও রচিত হতো, কিন্তু সে নিজেও সে-কথা আজ আর বিশ্বাস করতে পারে না।

প্রিয়-বিরহের বেদনায় সে'ও কাতর হয়ে পড়ে। তার অন্তর যে ইঁটের পাঁজার মতো ধিকি ধিকি জ্বলছে সে কথা কে জানে ?

প্রেম, প্রিয়জন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আরো কতদিন যে আলোচনা

হয়েছে—মালতীর তা মনে রাখার কথা নয়। একটা ক্ষত শুকিয়ে আসছে—সেখানে বারবার চিড় খেলে একটু জ্বালা করবে, একটু রক্ত ঝরবে। এ ত' স্বাভাবিক। তাই সে অত্যন্ত কষ্টের সংগেই নিজের ঘরে টেবিলের কোণে বসানো ফটো স্ট্যাণ্ড থেকে বসন্তের ফটোখানা খুলে নিয়েছে, নষ্ট করেছে, বসন্তের স্বাক্ষরটি পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়েছে—ছুরি দিয়ে ঘসে ঘসে। শুধু বসন্তের হাতের লেখায় নিজের নামটি তার ছবির নীচে যে খোদাই করা ছিল—সেটি রেখে দিয়েছে, আর রেখেছে নিজের ছবিটা। স্ট্যাণ্ডের ডান দিকের জায়গাটা খালি দেখে টুলু ওরা কত ব্যংগ করেছে; টু লেট্ স্পেস্ কতদিন থাকবে জানতে চেয়েছে। মালতী ম্লান হেসেছে ওদের সামনে, আড়ালে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে শুধু। বসন্তের ফটোটা নষ্ট করার সময় তার চোখের জল যেন বুকে গিয়ে জমাট হয়ে রয়েছে।

বসন্ত কিসের পিছনে ছুটছে? এক একবার এ প্রশ্ন বসন্তকে ব্যাকুল করে দেয়। সামান্য নেশা করে যে জীবনের আস্বাদ পেত, তৃপ্তি লাভ করতো, সেই বসন্ত মালতীর সংস্পর্শে এসে জীবনের একটা মানে খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল, ভোজবাজির মতো, তাসের ঘরের মতো হাওয়ায় তা মিলিয়ে গেল। অফিসের চাকরীতে আর কোন উন্নতি হয় নি। বরং কর্তারা বসন্তকে তাড়াবার জন্যেই ব্যগ্র। যেটুকু নিয়ম রক্ষা করলে চাকরি বজায় রাখা যায় ভালোভাবে, সেটুকু শৃংখলাবোধের পরিচয়ও বসন্ত আজ দিতে পারছে না।

অফিস থেকে সে কিছুদিনের ছুটি চাইলে। একটু দেশে বিদেশে ঘুরে না এলে মনটা তার ঠিক হবে না। কিন্তু কি যে তার জ্বালা, কোথায় তার অস্বস্তি তা নিজেও সে জানে না। তবু ভেতরে ভেতরে সে যে ভেঙে পড়ছে—হাল্কা হয়ে যাচ্ছে—এটুকু যেন পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে।

হঠাৎ রাস্তায় একদিন হাসির সংগে দেখা। একটু মুটিয়ে গেছে

সে, বয়স হয়েছে মনে হয়। চোখ মুখে বেশ স্তিমিত গাম্ভীর্য। দেহে লালিত্যের জোয়ার এখনও কমে নি। লাবণ্যের উচ্ছলতা তেমনই আছে।

বসন্ত রাস্তায় ফুটপাতের ধারে দাঁড়িয়ে জুতোয় কালি লাগাচ্ছিল। এমন সময় হাসিই তার কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা আপনি কি বসন্তবাবু? বাঁশধনীতে থাকতেন কখনো?

বসন্ত একটু চমকে উঠলো, পরে বললে, ও হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে চিনতে পারছি না। হ্যাঁ হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছি, নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না! হরিশরণ মামার ওখানে, হ্যাঁ থাকতুম বৈকি। আজ বছর দুই আব ও পাড়ায় যাই না।

নামটা পর্যন্ত ভুলে গেছেন? আমাকে একটুও মনে পড়ছে না, আশ্চর্য আপনার মন, বসন্তবাবু! হাসি বললে।

এই, একটু জলদি কর বাবা। ঠিক হ্যায়। হো গিয়া, বলে স্যু-বয়কে দুআনা পয়সা দিয়ে সেখান থেকে সরে এল বসন্ত, হাসিও এল।

হাসি আবার বললে, নামটা মনে পড়ছে না ত'? অথচ আমার বেশ স্পষ্ট মনে পড়ছে। আপনার সেই ছোট্ট ঘরখানায় রাত্রে ফিরে আপনি শুতে যেতেন, বেলা অবধি আপনার ঘুম --

বসন্ত বাধা দিয়ে বলে উঠলো। ও হোঃ—এইবার সব মনে পড়েছে—আপনি হরিশরণমামার শালী। তাই বলুন।

বসন্তের কণ্ঠস্বর একটু উচ্চকিত হয়ে গিয়েছিল। যেন বহুদিনকার আগে হারানো কোন অতি প্রয়োজনীয় জিনিস সে খুঁজে পেয়েছে। এই রকম তার মনোভাব হওয়াতে সে 'শালী' শব্দটা অত্যন্ত জোরের সংগে উচ্চারণ করে ফেলেছে, ফলে রাস্তার দুচার জন লোক একবার তার দিকে একবার হাসির দিকে তাকালে। হাসি একটু লজ্জিত হলো, বসন্তও ততোধিক অপ্রস্তুত হলো। ফলে আলাপে তাদের ছেদ পড়লো।

বসন্ত বললো, চলুন, একটু ফাঁকার দিকে যাই।

হাসি একটু হেসে বললে, যেতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু হাতে কিছু জরুরী কাজ নিয়ে বেরিয়েছি। এখনি যেতে হবে বইয়ের দোকানে, কিছু বইয়ের অর্ডার দিতে।

বসন্ত জিজ্ঞাসা করলে, এখন কি করা হচ্ছে?

মধ্যপ্রদেশের একটা ছোট্ট মেয়ে স্কুলের হেডমিস্ট্রেস হিসেবে কাজ করছি। ছুটিতে এসেছিলাম এখানে, পর্শু আবার ফিরে যাবো।

হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, তোমার নাম হচ্ছে হাসি। তোমার পাশের খবরও শুনেছিলাম। হরিশরণমামাকে তুমি রসোমালাই খাওয়াতে এসেছিলে একবার, পাশ করার পর। আমরা কিন্তু বাদ পড়ে গেছি। সব মনে পড়েছে এবার।—বসন্ত হঠাৎ যেন বিশেষ আন্তরিক হয়ে উঠলো।

হাসি নিজের হাতঘড়িটার দিকে একবার তাকালো, তারপর বললে, সব মনে পড়েছে আপনার, সব? বেশ ত', খাওয়াটা আপনার ধরলাম পাওনাই আছে। একবার আসুন না। চিরিমিরিতে, মধ্যপ্রদেশে, আমার কর্মস্থলে; বেড়িয়ে যাবেন। আজকে আমাকে এখুনি যেতে হবে। আমার প্যাডের একটা কাগজ দিয়ে গেলাম। এখানে ঠিকানাটা আছে।

হাসি চলে গেল। বসন্ত সাদা কাগজখানার দিকে একবার তাকালো তারপর ভাঁজ করে সেটা পকেটে রেখে দিল। হাসির কাছে সে আজ এমনি ধারা শূন্য, রিক্ত হয়ে গেছে। সাদা কাগজের মতই; অথচ একটি চিঠির মাধ্যমে হাসির মনের কিছু দুর্বলতার খবরও বোধহয় বসন্তের কাছে পাঠানো হয়েছিল; সে চিঠিখানার সম্পূর্ণ কথাগুলি আজ মনেও নেই বসন্তের। সে দাবীও নেই, তবু শুধু একটা সাদা কাগজ দিয়ে কি সেই পত্রের ভবিষ্যৎকে ব্যংগময় করে তুল্লে নাকি হাসি! কিছুই বলা যায় না, শিক্ষিত মেয়েদের প্রতিশোধ নেবার কায়দাই হয়তো আলাদা।

বসন্তের কেমন জেদ চেপে গেল। হাসির এই ব্যংগের জবাব দিতে হবে। চিরমিরি তাকে যেতেই হবে।

চিরমিরি যাবার সোজা পথ এলাহাবাদ হয়ে, ইষ্টার্ণ রেল দিয়ে। কয়লা শিল্পের ঘাঁটি। ঝরিয়ার মত কাছে নয়, কোলকাতা থেকে বেশ দূরে, আর স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া। প্রাকৃতিক দৃশ্যাদিও মন্দ নয়। বসন্ত কবি নয়, কল্পনাপ্রবণও নয়, তবু চিরমিরির দৃশ্যপট তাকে মুগ্ধ করে দিলে।

টংগাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করতেই মুগাইটোলার মেয়ে স্কুলের পতা মিললো, মিললো হাসির কোয়ার্টারও।

হাসি ছিল না, কোথায় যেন বেরিয়েছিল, বসন্ত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে লাগলো।

কিসের টানে সে এসেছে? বসন্ত ভাবতে লাগলো। তার মনটা এমন ধারা শূন্য হয়ে গেছে। কোন্ কাজ সে করবে, তা আগে থেকে আর ঠিক করতে পারে না। উদ্দেশ্যহীন, এলোমেলো। এমনি তার জীবনের গতি হয়েছে। হাসির কাছে সে এসেছে কিন্তু কিসের সম্পর্কের জোর? হরিশরণবাবু তার দূর সম্পর্কের এক মামা। তার আবার অতি দূর সম্পর্কের শালী। নিতান্ত অবহেলিত অবজ্ঞাত হয়ে পড়ে থাকতো বলে হয়তো একটু করুণাকণা ছিটিয়েছিল হাসি—তার দিকে। সেই দাক্ষিণ্যের আশীর্বাদকে বড় করে দেখা শুধু বসন্তের পক্ষে মূঢ়তা নয়, অন্যায়ও নিশ্চয়। বসন্ত চঞ্চল হয়ে পড়েছে। কোন বিশেষ নারীকে কেন্দ্র করে যে তার এই চাঞ্চল্য তা নয়। নিজের মনেই কেমন যেন এক করুণ অসহায় ছটফটানি শুরু হয়েছে। কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মতো বুঝি তার দুর্দশা!

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে হাসি ফিরলো। খুব সুন্দর চক্‌চকে প্রকাণ্ড এক মোটর থেকে নেমে প্রথমেই সে বসন্তকে দেখে বিস্মিত হলো। এরই মধ্যে বসন্ত তার ডাকে সাড়া দেবে। সশরীরে এসে হাজির হবে, বোঝা যায় নি। বসন্তের মনে পলাশ আর মহুয়ার নেশা ধরলো নাকি এতদিনে? নইলে এতদূরে এমন দ্রুত আর এমন সহসা ছুটে আসা কেন? হাসি বলেছিল, কথার কথা। তাই সে সত্যি ধরে নিল কেন?

মুখে অত্যন্ত খুসির ভাব দেখিয়ে হাসি বিস্ময় প্রকাশ করলে, একটু সহানুভূতির সুরে বললে, এত তাড়াতাড়ি আমার ডাকে সাড়া পাবো, ভাবিনি। আমার কী সৌভাগ্য।

কারুর ডাকে কখনো সাড়া দিইনি, এমন অপযশ বোধহয় আমার নেই।—বসন্ত বললে।

হাসি অতীত দিনের একটি বিগত অধ্যায় খুলে এখনই প্রমাণ করতে পারে।—বসন্ত মিথ্যাবাদী। কিন্তু আজ তার সে প্রবৃত্তি হলো না। তার প্রয়োজনও নেই কিছু। হাসি বসন্তের সুটকেশ আর হোল্ডলটা ভেতরে তোলার হুকুম দিলে চাকরকে। বসন্তকে বললে, মুখ হাত পা ধুয়ে নিন। ভেতরে চলুন।

চা পর্ব চুকলো। হাসি অতীত দিনের জীবনকে যেন মুছে ফেলেছে। একবারও বাঁশধনিতে বাস করার কথা উঠলো না, হরিশরণ মামার কথা নয়, সেদিনের বসন্তের কথাও নয়। মধ্যপ্রদেশ কেমন স্বাস্থ্যকর, গরমে কেমন অসহ্য, এর প্রাকৃতিক দৃশ্য কি মনোরম, এখানের বনজংগল জন্তু জানোয়ার, সব কিছুর আলোচনা হলো।

ধীরে ধীরে বসন্তের মনে পড়লো, এই হাসিও একদিন তার জন্যে ভাবতো, এমন কি—

বসন্তের সব কথা মনেও পড়ে না। শুধু অস্পষ্ট একটা করুণাময়ী মূর্তির আবছায়া রূপ তার ছেঁড়া ময়লা অগোছালো বিছানার পাশে পাশে ঘুরছে, মনে হয়। সারাদিন রোদে ঘোরা ক্লান্ত মলিন উত্তপ্ত কপালের ওপর নরম স্নিগ্ধ হাতের আঙুল চালনার কথা যেন মনে পড়ে। স্নেহ সজল কাতর দুটি চোখ সেই ভবঘুরে বেয়াড়া পথে চলা, জীবনকে ফুঁকে দেওয়া ছেলেটার কল্যাণ কামনায় ভিজে ওঠে, মনে পড়ে।

বসন্ত একবার ভাবলে, হাসির পরিবর্তনটার কথা উল্লেখ করে, অতীতের নিভে যাওয়া রোশনাই জ্বালে, কিন্তু বদলে যাওয়াই ত' জগতের নিয়ম। তার নিজের জীবনের দিক থেকে বদলানোর দার্শনিক তত্ত্ব যে কত নির্মম সে কথা চট্ করে মনে হতেই চুপ করে গেল।

হাসি বললে, চুপ করে আছেন যে বড়! কিছু ভাবছেন বোধ হয় না, এখানকার দৃশ্য দেখে কবি হয়ে উঠলেন? কেমন লাগছে জায়গাটা?

বসন্ত বললে, এর মধ্যে বলা মুস্কিল। তবে, খারাপ লাগছে না।

ভাল সময়ই এসে পড়েছেন। পরশু আমরা অমরকণ্টক যাচ্ছি বেড়াতে, যাবেন নিশ্চয়ই।

অমরকণ্টক? সে কোথায়?

পেণ্ড্রারোড থেকে যেতে হয়, বোধহয় সতেরো মাইল হবে?

পেণ্ড্রারোড? এখান থেকে যাওয়া যায় নাকি?

হ্যাঁ, কাটনী হয়েই ত' যেতে হয়। কাটনী থেকে বিলাসপুরের যে ব্রাঞ্চ লাইন,—সেই লাইনে পেণ্ড্রারোড পড়ে। আমরা অবশ্য মোটরে যাবো।

পেণ্ড্রারোডে না একটা ভালো টি, বি, স্যানাটোরিয়াম আছে?

হ্যাঁ।

বসন্ত ঈষৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

হাসিও আর বিশেষ কিছু বললে না।

বিকেলে আবার কথা হলো চায়ের টেবিলে বসে। হাসি বললে, আপনার অনেক রকম অভ্যাস ছিল, সে সব বুঝি ঘুচে গেছে। এখন ত' দেখছি শুধু সিগারেট ছাড়া আর অন্য কোন নেশা নেই।

বসন্ত কিছু না বলে হাসির দিকে তাকালো।

হাসি বললে, উনিও বলছিলেন একটু আগে। বললেন যে, তোমার বন্ধু খুব পোড়-খাওয়া লোক। তাই না?

বসন্ত বললে, উনি মানে? মধ্যাহ্নে যাকে দেখলাম, ওই মিঃ দিলজিৎ সাহনী?

হ্যা, তিনি একটা বড় কলিয়ারীর ম্যানেজার। আমার বন্ধু ছিলেন, বর্তমানে আমরা উভয়ে কি বলবো—এন্‌গেজ্‌ড্‌।

আমিও কতকটা সে রকম আন্দাজ করেছি। কিন্তু উনি আমার

চরিত্র সম্পর্কে এতটা ওয়াকিবাল হলেন কি করে? কোন্ দিক থেকে পোড়খাওয়া, ঠিক ত' বুঝলাম না!

হাসি এবার আর কিছু বলতে পারল না। মিঃ দিলজিৎ সাহনীকে তাদের কথাবার্তার মধ্যে টেনে আনা ঠিক হয়নি; বসন্ত হয়তো যা-তা একটা মন্তব্য করতে পারে, অথচ প্রতিবাদ করে বসন্তকে যথাযথ প্রত্যুত্তর দেওয়া যাবে না, অতিথির অপমান ঘটবে।

প্রসংগটা ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করে হাসি।

বসন্ত কিন্তু খেই ধরে থাকে; সে বলে, প্রেমের দিক থেকে যদি আমাকে পোড়খাওয়া বলো, তাহলেও ভুল হবে। প্রেম নিয়ে বেসাতি করার মতো মন আমার নেই। যাকে ভালবেসেছিলাম, তাকে বিয়েও করেছিলাম।

বিয়ে? আপনি বিবাহিত? কই এ সুখবর ত' আমরা পাই নি। বিয়ের খাওয়া থেকে ফাঁক পড়লাম! হাসি হাল্কা সুরে বললে।

নিতান্ত সাধারণ অনাড়ম্বর রেজিষ্টার্ড ম্যারেজ। অর্ধেক রাজ্য নয়, রূপবতী রাজকুমারীও নয়। রুগ্ন দরিদ্র অনাথ একটি বাঙালী গেরস্ত মেয়ে। দুচারটে কথা দিয়ে আলাপ সুরু, তারপর মন কেমন করা, প্রেম, এবং শেষে, বিয়ে—মৃত্যু।

মৃত্যু! হাসি একটু করুণ হবার চেষ্টায় প্রশ্ন করলো।

হ্যাঁ, বিয়ের ছ' মাস যেতে না যেতেই ধরা পড়লো সে যক্ষ্মা-রোগে ভুগছে। চিকিৎসা সুরু হলো, যমে মানুষে টানাটানি, মানুষ হার মানলো। বেরিয়ে পড়লাম নিঃস্ব হয়ে, এ দিক থেকে অবশ্য পোড়খাওয়া বলতে পারা যায় আমাকে—

হাসির মন অত্যন্ত করুণ হয়ে ওঠে। বসন্তকে সে আগাগোড়া জানে না, কিন্তু সহায় সম্বলহীন অনাদৃত এক তরুণ যুবকের কি গভীর অবহেলা সে নিজের চোখে দেখেছে, সেকথা আজ সে স্মরণ না করে পারলো না; সেদিনও যেমন তার মনে একটা বেদনা জেগেছিল, আজও তেমনি সে মমতাপ্রবণ হয়ে উঠলো। মিঃ সাহনী বসন্তকে

বোধ হয় চোয়াড়ে,—এই রকম একটা ইংগিত করেছে। এবং হাসি তারই ভদ্র বাংলা করে পোড়খাওয়া লোক বলেছে বসন্তকে, আর সে ভাল অর্থেই সে কথা গ্রহণ করে এই রকম একটা ব্যাখ্যা করবে তার, হাসির মোটেই তা জানা ছিল না। সে বিপত্নীক, আগাগোড়া বঞ্চিত-সর্বস্ব জীবনে তার পাওনার ঘরে কিছুই সঞ্চিত হলো না শুনে হাসিও বেশ সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে উঠলো।

বসন্ত বললে, আর যদি আমার অতীত জীবন সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করতে চাও, তাহলেও জানিয়ে দেবো। আমি চূড়ান্ত নেশাখোর ছিলাম। কিন্তু এখন বাধ্য হয়ে নেশা ছেড়ে দিতে হয়েছে। প্রথমতঃ চাকরির জন্যে, দ্বিতীয়তঃ আমার স্ত্রীর অনুরোধে। তার একটা অনুরোধও রাখবো না এমন দুর্বৃত্ত আমি নই।

হাসি লক্ষ্য করছিল, আগের বসন্ত আর নেই। আগে কোন আঘাত তাকে বিচলিত করতে পারে নি, এখন সে সামান্য একটা কথায় বিহ্বল হয়ে ওঠে। হাসি বললে, ওসব প্রসংগ থাক এখন। চলুন আজ সন্ধ্যের পর কাটনীর দিকে বেড়িয়ে আসি, সেখানে একটা আজ ভালো কনফারেন্স আছে। এই অঞ্চলের বাঙালী মেয়েদের 'মিলিতা' বলে একটা ক্লাব আছে, কাটনীতে আজ তাদের বার্ষিক সভা। আপনি বাংলা দেশ থেকে সদ্য আগত, আপনার উপস্থিতি ওখানে সকলেরই আনন্দের বিষয় হবে।

বসন্ত চট্‌পট্ জবাব দিলে, সকলের যা আনন্দের বিষয়, নিশ্চয়ই আমার পক্ষে তা আনন্দের নাও হতে পারে। আপনারাই ধরে বসবেন, সভায় কিছু বলুন। আমি যা বক্তৃতাবাগীশ, তাতে বাক্যবীর বাঙালী জাতের একটা দুনাম রটে যাবে। তোমরাই বরং ঘুরে এসো।

সন্ধ্যের সময় মিঃ দিলজিৎ সাহনী এলেন গাড়ী নিয়ে। লোকটা সত্যিই ধনী ; কথায় কথায় তা প্রকাশও হয়ে পড়ে বটে, কিন্তু খুব মিশুকে লোক, আমুদেও বটে। বসন্তকে একেবারে আপনার করে নিলে যেন। সে পর্যন্ত বসন্তের হাত ধরে টানাটানি, কাটনীতে

মিলিতা ক্লাবের সভায় যাবার জন্যে, কিন্তু বসন্ত কিছুতেই যেতে রাজি হয় না। অগত্যা বসন্তকে রেখেই হাসি আর মিঃ সাহনী চলে গেল।

হাসি যে তাকে তার নাম আর ঠিকানা জানাতে একদা সাদা কাগজ দিয়ে এসেছিল, সে নিছক ভব্যতা বা সৌজন্য রক্ষার জন্যেই, তাতে নিমন্ত্রণের আন্তরিকতা যেমন ছিল না, তেমনি করে কিশোরী বয়সে বসন্তকে কি সব লিখেছিল পাখির অর্থহীন কাকলির মতো কলকল করে, যার প্রত্যুত্তর পায় নি, তাও আজ আর মনে ছিল না। বসন্তের বরং এখানে না এলেই ভালো হতো। কাল সকালে কোন রকমে দুর্গা দুর্গা বলে কোলকাতার পথে বেরিয়ে পড়তে পারলে বেঁচে যাবে সে। অমরকণ্টক যাওয়ার তার বাসনা নেই, আর হাসি এবং সাহনীর মাঝখানে ব্যর্থ প্রেমের বাসি গন্ধ স্মরণ করে সে নিজেকে কেন জারিয়ে রাখতে যাবে,—এতদূর দীনতা তার নেই। বসন্তের বিয়ের খবর যেমন হাসি জানতো না, তেমনি হাসির খবর সে কিছু পায় নি। অন্ততঃ সাহনীর সংগে হাসির বিয়ে হবে—এ খবরও বসন্ত পায় নি আগে।

রাত্রি দশটা নাগাদ হাসি একাই ঘুরে এল সাহনীর গাড়িতে। সাহনীর সোফার দিয়ে গেল তাকে। মিটিং সুন্দর হয়েছে। পেণ্ড্রারোড হাসপাতালের দুটি নার্স এবার কাটনীতে চাকরি নিয়ে এসেছে। তারাই 'মিলিতা'র এ সভাকে বিশেষ করে উজ্জ্বল করেছে।

বসন্ত জিজ্ঞাসা করলে, পেণ্ড্রারোড হাসপাতাল মানে? ওখানে, টি, বি, স্যানাটোরিয়ামের নার্সেরা নাকি?

না, স্যানাটোরিয়াম ছাড়া পেণ্ড্রারোড স্টেশনের কাছে আরো একটা বড় হাসপাতাল আছে, সেখানকার দুটি বাঙালী নার্স নতুন চাকরি নিয়ে কাটনী রেল হাসপাতালে এসেছে, তারা দুজনেই এবার উদ্যোগী হয়ে মিটিং পরিচালনা করেছে। আমরাও এবার ওদের দুজনকেই নিলাম কার্যকরী সমিতিতে। প্রীতি বলে যে মেয়েটি—তাকে ত' মিলিতার সেক্রেটারী করে দিলাম। আর একজনকেও

কমিটিতে নেওয়া হলো, সে মেয়েটিও বেশ কাজের দেখলাম। মালতী না কি নাম যেন বললে।

মালতী! কেমন দেখতে বলুন ত'? চাপা একটা আগ্রহের সংগে বসন্ত জিজ্ঞাসা করলে।

হাসির চোখ এড়ালো না। মালতী নামটা বসন্তকে যেন একটু চঞ্চল করে দিয়েছে। সে বললে, এমনি সাধারণ চেহারা। একটু পাৎলা, ছিপছিপে গড়ন, ফর্সা রঙ। কথা কম বলে, কাজ করে বেশী। হঠাৎ মালতী সম্পর্কে আপনার এ রকম কৌতূহল কেন বলুন ত'?

বসন্ত একবার হাসির দিকে সন্দেহের চোখে তাকালে, কিন্তু পাছে সে ধরা পড়ে যায়। সেজন্যে একটা নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে, আমার এক আত্মীয় মধ্যপ্রদেশের এই দিকে কোন এক হাসপাতালের নার্স শুনেছিলাম, তাই জিজ্ঞাসা করছি। আচ্ছা, এই মালতা কি বিবাহিত দেখলে?

না, কপালে বা সিঁথিতে সিঁদুর দেখলাম না।

একটু চপল, একটু চঞ্চল, বকর বকর করছে রাতদিন!

না, বরং ধীর স্থির গম্ভীর বলেই মনে হলো। কথা ত' বলেই না, সব সময় একটা থমথমে ভাব। হাসি বললে।

আচ্ছা, কতদিন হলো সে কাটনীতে এসেছে?—বসন্ত জিজ্ঞাসা করলে।

ঠিক বলতে পারি না, তবে ছ' মাসের বেশী নয়। নববর্ষে আমাদের একটা বড় মিটিংও হয়েছিল, তখন ত' ওদের দেখিনি।

আচ্ছা, ওরা পেণ্ড্রায় কতদিন আছে বলতে পারো?

হাসি বললে, না। আপনার জেরা ত' দেখছি শেষ হয় না। ব্যাপার কি বলুন ত'?

ব্যাপার কিছুই নয়। আমার যেন কেমন মনে হচ্ছে, এই মালতীই বোধহয় আমার সেই আত্মীয়া। আমি একবার মালতীর সংগে দেখা না করে যাচ্ছি না। এতদূর যখন এসেছি। বসন্ত একটু উত্তেজনার সংগেই কথা কটি বললে।

হাসিরও কেমন যেন কৌতূহল হলো। যদি সে আগে জানতে পারতো যে মালতী সম্পর্কে বসন্তের এমন একটা অধীর জিজ্ঞাসা আছে, তাহলে সে সবিশেষ পরিচয় নিয়েই আসতে পারতো। মালতীকেই জিজ্ঞাসা করা তার পক্ষে এমন কিছু অসংগত বা অসম্ভব হতো না।

বসন্ত বললে, কাল সকালেই আমি চিরমিরি থেকে চলে যেতে চাই, একবার কাটনী হয়ে কাল বিকেলের গাড়িতে কোলকাতা ফিরবো। তোমার আমন্ত্রণ রাখার জন্যে এসেছি, দেখা হলো, এই বেশ। এই আলাপকে আর বিলম্বিত করা যায় না।

কি বলছেন আপনি? হাসি জিজ্ঞাসা করে।

ঠিকই বলছি। আপনার আর মিঃ সাহনীর জীবন সুখের হোক, এই কামনা করি।

আচ্ছা, উনি কাল আসুন ত', তারপর যা হয় ঠিক হবে।

না, না, হাসি দেবী। তা হয় না, কাল সকালের বাসেই আমি কাটনী যাবো।

বাসে যাবেন কেন? ওর গাড়ীতে করে আপনাকে ঘুরিয়ে আনবো! কতক্ষণ লাগবে?

না, তার কোন দরকার নেই। মিঃ সাহনীকে আমার নমস্কার জানালাম। আমি তোমার দাক্ষিণ্য নিতে পারি সহজে, কিন্তু ওঁর দাক্ষিণ্যকে দয়া বা ভিক্ষা বলে যে মনে হয়।

হাসি শুধু বসন্তের চোখের দিকে একবার তাকিয়ে আর কিছু বললো না।

হাসি জানতো বসন্ত জেদী, তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধা দেওয়া চলে না। সুতরাং এখানকার বিদায় দৃশ্যে কোন রঙ বা ঔজ্জ্বল্যের অবকাশ ঘটলো না। নিতান্ত সাধারণ, নিতান্ত মামুলি ভাবেই বসন্ত চলে গেল। হাসি বুঝতেই পারলো না, কেনই বা সে এল তার কাছে, আর এমনি সহসা কেনই বা চলে গেল। কোন প্রত্যাশার স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল নাকি বসন্ত!

একটা হোটেলে গিয়েই উঠলো বসন্ত। কাটনী তার অপরিচিত জায়গা, তবে খুব ছোট সহর বলেই ভরসা। রেল হাসপাতালে খোঁজ করে বার করা যাবে, আর একটু সন্ধান করলে মালতীকেও দেখা যাবে--এ কোন্ মালতী! চেহারার বর্ণনায় না মিলুক, তবু এত কাছে এসে একবারও মালতীর সন্ধান না করাটা সত্যিই খুব অন্যায় বলে মনে হয়েছে বসন্তের।

মালতীর জন্যে তার একটা আকৃতি জেগেছে। কাতরতার একটা তীব্র চাবুক তার মনে দাগ কেটে বসেছে। অসহায় রোগ-পাণ্ডুর মালতীর করুণ চোখতুটিকে তার বিশেষ করে মনে পড়ছে। এক একবার মালতীর জন্যে সহানুভূতিতে আর একবার নিজের অনুশোচনায় বসন্ত ছটফট করতে লাগলো।

এখানকার এই মালতী যদি তার মালতী না হয়? এক নামের কত মেয়েই ত' আছে। বিশেষ করে মালতীর মতো নাম—প্রতিশ'য়ে অন্ততঃ দশটা কি বারোটা মিলবে।

মালতী তাহলে কি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে? বসন্ত নিজেকে বড় অপরাধী মনে করতে লাগলো।

একটা গোটা দিন চলে গেল হাসপাতালের খোঁজ করতে। কত বড় রেল হাসপাতাল, তা ছাড়া এই সংগে বাইরের লোকের চিকিৎসার জন্যে আলাদা একটা ছোট্ট হাসপাতালও সরকারের খরচে চলে। শোনা গেল, সেখানেই নতুন লোক এসেছে। সেখানকার এক জমাদারকে কিছু বখশিস্ দিয়েও নতুন নার্সের কোন খবর মিললো না।

রাত্রে বসন্তের মনে পড়লো—'মিলিতা' ক্লাবে খোঁজ করলেই ত' ল্যাটা চুকে যেত। কিন্তু কোথায় সে ক্লাব? তা তার জানা নেই। তবে বাঙালী মেয়েদের প্রতিষ্ঠান। হয়তো হোটেলের ম্যানেজারের কাছে সন্ধান মিলবে এই ভরসায় সে ম্যানেজারের সন্ধান করলো। একটু পরে দেখা গেল ম্যানেজার আসেন নি। একটি বয় একটি বোতল নিয়ে এসে হাজির। তার কাছে ব্যাপারটা একটু নতুন

লাগলো। সে সরাসরি ম্যানেজারের কাছে গিয়ে হাজির। ম্যানেজার তাকে বুঝিয়ে দিলেন, রাত্রে তাকে ডাকা মানেই কিছু পানীয়ের বন্দোবস্ত করা। সাধারণ এই নীতি মেনে নেওয়াতেই এই বিপত্তি। তা যাক্, বসন্তবাবু কিছু মনে না করলেই বাঁচা যায়।

বসন্ত 'মিলিতা' ক্লাবের হদিস চাইলে।

মিলিতা ক্লাব? ওঃ, সে ত' এক বিরাট ব্যাপার। সব বাঙালী বাবুদের ভোজের সভা হয়, থিয়েটার, বায়োস্কোপ, কোলকাতা থেকে বাবু আসে। সে ত' এখন বন্ধ আছে। এই ত' কাল রাত্রেই শেষ হয়ে গেল। গোলবাজারের মাঠে প্যাণ্ডেল হলো, মিটিং হলো।

হ্যাঁ --কিন্তু ক্লাবটা কোথায়?

ওই গোলবাজারে কোথায় হবে। কাল সকালে ওর খোঁজ মিলবে।

আরো একটা রাত তাকে কাটাতে হবে। সংশয়, দ্বিধায়, সন্দেহে যেমন সে আকুল হবে, তেমনি অনুশোচনায়, আত্মগ্লানি আর ধিক্কারে সে জ্বলে পুড়ে মরবে।

সকালে গোলবাজারে ঘুরেও হয়রান হলো সে। মিলিতার খোঁজ মেলে নি। দোকানদার সকলেই প্রায় অবাঙালী, বোধ হয় সেইজন্যে বাঙালী প্রতিষ্ঠানের পাকা হদিস দিতে পারে নি। কাল এখানে মিটিং হলো, খানা পিনা হলো, নাচনা গানা হলো, কিন্তু কোথায় তাদের ক্লাব বা পতা কারুরভি জানা নেই।

ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছিল যখন বসন্ত, তখন পথে একটি বাঙালী তরুণীর সঙ্গে দেখা। সে মরীয়া হয়ে তাকেই জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা, দেখুন, এখানে 'মিলিতা' ক্লাবের ঠিকানা আপনার জানা আছে কি?

তরুণীটি সন্দিহান হয়েই জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কোত্থেকে আসছেন?

কোলকাতা থেকে।

মিলিতা ক্লাবে কাকে আপনার চাই?

আমি শুধু ক্লাবের ঠিকানাটা চাই। ওখানকার যে কোন একজন সভ্য বা সভ্যা পেলেই আমার হবে।

বেশত', আপনার প্রশ্ন আপনি সানন্দে আমাকে জানাতে পারেন।

আপনি কি বলতে পারেন, পেণ্ড্রারোড স্যানাটোরিয়ামে থাকতো একটি অসুস্থ মেয়ে, নাম মালতী—সে এখানে আছে কিনা, রেল হাসপাতালে নার্সের চাকরী নিয়ে এসেছে বোধ হয়।

তরুণীটি কোন জবাব না দিয়ে তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করতে লাগলো।

বসন্ত আবার জিজ্ঞাসা করলে।—ঐ একই প্রশ্ন।

তার অধীরতা দেখে তরুণীটি পাল্‌টা জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কি তার কেউ হন?

কেউ মানে? সে যেন সব কিছুই বলার জন্যে তৈরী। এমনই আকুল হয়ে পড়েছিল, পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, হ্যাঁ। আমি তার আত্মীয় হই।

কিন্তু তার যে কোন আত্মীয় আছে কোথাও—তা ত' শুনি নি, তার এক বোন শুধু বর্মায় থাকে জানি।

ঠিকই জানেন। আমি বর্মা থেকেই আসছি। তার ছোট বোনের স্বামী! বসন্তের ঠোঁটে মিথ্যাভাষণের কোন আড়ষ্টতা নেই। —মালতীকে খুঁজে পেয়েছে তাহলে—

কিন্তু মালতীর স্বামী কেমন লোক বলুন ত'? হাসপাতালে তাকে ভর্তি করিয়েই খালাস হয়ে গেছেন। শেষের দিকে টাকার অভাবে চিকিৎসা প্রায় বন্ধ হবার জোগাড় হয়েছিল। ওখানকার ডাক্তারদের দয়াতেই মালতীদি জীবন ফিরে পেয়েছে।

হ্যাঁ, সব জানি, কিন্তু —

বলছি তার ঠিকানা। মালতীদি আর আমি একই বাসায় থাকি, ক্যাষ্টর রোডের তিন নম্বর ব্লকের ডি ফ্ল্যাটে। আমার নাম প্রীতি। স্যানাটোরিয়াম থেকে এক ডাক্তারের সুপারিশ নিয়ে আমাদের ওখানে পেণ্ড্রারোডের হাসপাতালে মালতীদি যায় কাজের জন্যে। যা

হোক একটা কিছু জোটে। নিজের গুণে, কিছুটা বরাত জোরে ও নার্সিং পাশ করে—চাকরীতে পাকা হয়। আমার দাদাকে ধরে রেল হাসপাতালে একটু ভালো মাইনেয় বদলি হয়ে এসেছি আমরা দু'জন, মাস' চারেক হলো।

একবার তার সংগে দেখা করতে যে চাই, আপনি কি এখনই ফিরবেন বাড়িতে? বসন্ত অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে।

না, এইমাত্র ফিরছি। মালতীদি এখন বাড়িতে আছে, আপনি একটা সাইকেল রিক্সা করে চলে যান, দু' আড়াই মাইল হবে। আমি এখানে বিশেষ কাজে এসেছি, কাল এখানে আমাদের একটা ফাংসন হলো, তার সব বিল টিল চুকিয়ে দেবার জন্যে এসেছি, আর নানা রকম জিনিস নানা জায়গা থেকে আনা হয়েছে। সেগুলোরও ব্যবস্থা করতে হবে এখনই—হ্যাঁ, ভালো কথা, আপনি উঠেছেন কোথায়?

গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল বোর্ডিংয়ে—

না, না, হোটেলে থাকার দরকার নেই, আপনি আমাদের কোয়ার্টারেই সোজা চলে আসুন; ওখানে একেবারে সেপারেট ব্যবস্থা, কোন অসুবিধে হবে না।

আমি ত' চিনে যেতে পারব না, বসন্ত আমতা আমতা করে বলে।

আমি একটা সাইকেল রিক্সা করে দিই, ও একেবারে আমাদের কোয়ার্টারে নিয়ে যাবে, আনা বারো পয়সা ওকে দিয়ে দেবেন।

প্রীতি মেয়েটিকে বেশ লাগলো বসন্তের। যেমন স্নিগ্ধ তেমনই মধুর। স্বল্পপরিচয়েই যেন ভালবাসতে ইচ্ছে করে। এমন ব্যবহার করলে যেন কতদিনের চেনা। এখানেই মানুষের মহত্ত্ব নির্ভর করে। এমন করে পরকে আপন বলে ভাবতে।

কিন্তু মালতীর কাছে কোন্ মুখ নিয়ে গিয়ে সে দাঁড়াবে? ক্ষমা যদি মালতী না করে? না করাই ত' মালতীর পক্ষে স্বাভাবিক। যুদ্ধে হেরে বন্দী হওয়ার মধ্যেও একটা মর্যাদা আছে, কিন্তু জীবন-যুদ্ধ

থেকে যারা কাপুরুষের মতো পালায়—সঙ্গীকে অসহায় ভাবে শত্রুর মুখে ফেলে, তার যে কোন ক্ষমা নেই। নিজের কাছেই সে কি শুধু ছোট হয়ে যায়? পৃথিবীর সবার কাছে কি আরো বেশী রকম ছোট হয়ে যায় না।

কিন্তু বসন্তই শুধু এ বেদনা বহন করে বেড়াবে? তার দিকের কোন কথা কথা কি থাকতে নেই? তার তরফে কি এতটুকুও যুক্তি নেই? পথের আলাপী মানুষের জন্য তার শ্রমের স্বল্প-মূল্যও স্বীকার্য নয়? প্রেমের প্রতি তার কি আনুগত্যের সম্পূর্ণ অভাব ছিল?

নিজের স্বপক্ষে একটা যুক্তির কথাও দাঁড় করাতে পারে না মনে। সে ভেতরে ভেতরে নিজেকে খুব হাল্কা বোধ করে। সে কি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল! পিঠে মেরুদণ্ডটা তার গুঁড়ো হয়ে গেছে নাকি?

সকালের সূর্য এরই মধ্যে আকাশের অনেকটা পথ অতিক্রম করেছে। নির্মেঘ নীল আকাশ, আজ তারও বর্ণ যেন পুড়ে যাচ্ছে, তামাটে হয়ে উঠেছে আকাশ। প্রকৃতির শ্যামশ্রী তেমন নেই যেন, দগ্ধ ধূসর বলে মনে হচ্ছে। তার মনের প্রকাশ কি অভিব্যক্ত হয়ে পড়েছে? প্রকৃতি কি তার মনের সুরটুকু দিয়ে রাগিণী বাজাচ্ছে?

রিক্সাওয়ালা বললে, এ হি ক্যাষ্টর রোড, আউর ওহি তেসরী নাম্বার ডি—বালা ফ্ল্যাট।

রিক্সাওয়ালার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে শংকা-সংশয়-ভয়-অনুশোচনা জড়ানো পায়ে বসন্ত ডি ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। হ্যাঁ, প্রীতিদির নির্দেশ অনুযায়ী এই বাড়িটাই হয়। সামনেই কোয়ার্টার। দরজার ডান পাশে ওপরের কোনায় 'পুস' লেখা একটি বোতাম, কলিংবেলের হবে নিশ্চয়।

বসন্তের সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো। পায়ের কাছ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে নাকি? মালতী! সেই রুগ্ন, ক্ষয় রোগে তিল তিল করে ক্ষয়ে যাচ্ছিল যে মেয়েটি, সে আজ লুপ্ত স্বাস্থ্য ফিরিয়ে নিয়ে এখানে বসবাস করছে। সেই মালতী, প্রথম দিন যাকে অসহায়ভাবে

একটা অফিসে চাকরির জন্যে ইণ্টারভিউ দিতে গিয়ে দেখেছিল। তারপর যাকে সে নিজের জীবনের সংগে জড়িয়ে রেখেছিল ?

কলিংবেলের আওয়াজটাও কি বিশ্রী, বসন্তের মনে বেদনার যে কটা তন্ত্রী ছিল, তাও যেন ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠলো। নারী কণ্ঠের আওয়াজটা যেন চেনা চেনা, হয়তো মালতীর হতে পারে। শুকলাল, দেখো কোন্ আয়ে হেঁ—

মিনিট খানেক পরে দরজা খুললো শুকলাল। ভয়ে ভাবনায় বসন্ত নিজের বেপথুমান শরীরটাকে স্থির রাখতে পারছিল না, বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করছিল, কি ভাবে প্রথমেই সে মালতীর সামনে মুখ তুলে দাঁড়াবে, চোখে চোখ রাখবে।

বসন্ত আমতা আমতা করে জড়ানো গলায় জিজ্ঞাসা করলে। মালতী দেবী হিঁয়া রহতে হেঁ ?

জরুর ! আপ্ বৈঠিয়ে। শুকলাল বললে, দিদিমণি গোসলমে গ্যেয়ে হেঁ।

শুকলাল বাথরুমের বাইরে থেকেই জানালে, যে এক বাঙালী বাবু এসেছেন দেখা করতে।

বাঙালী বাবু ? মালতী ভেবেই কূল পায় না। তার সন্ধানে আবার কোন্ বাঙালী আসবে ? বোধহয় মেজর দত্ত এসেছেন। তার জীবনে অমন ডাক্তার সে আর দেখেনি। একটু দ্রুত স্নান সেরে বেরিয়ে এল মালতী।

সিক্ত কেশ, রিক্ত দৃষ্টি। তার ওপর পরনে সাদা শাড়ী চওড়া কাল পাড়ের, একটু স্নো পাউডারে নিজেকে ভব্য করে এসে দাঁড়ালো। তবু পবিত্রতার নবীনতার একটা ছাপ নিয়ে সে মেজর দত্তের সামনে আসুক, এই মনে করেই নিজেকে ঈষৎ বিন্যস্ত করে নেবার দ্রুত চেষ্টা সে করতে লাগলো।

দরজা খুললো শুকলাল। তবু যেন একটু খানি নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাওয়া গেল।

বাইরের ঘরে বসে বসন্তের প্রথমেই টেবিলের কোণে দৃষ্টি পড়লো। মালতীকে দেওয়া তার সেই ফটো স্ট্যাণ্ডটা দেখতে পেল। ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুকের ভেতরটা, ওখানে একটা ফটো নেই, বসন্তের ফটো। জায়গাটা খালি পড়ে আছে। মালতীর ফটোটা রয়েছে। বসন্ত উঠে গিয়ে ফটো স্ট্যাণ্ডটি নেড়ে দেখলো, তার সইটাও নেই, ছুরি দিয়ে বোধহয় চেঁচে তুলে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার লেখা মালতীর নামটা অম্লান হয়ে আজো মালতীর ফটোর তলায় রয়েছে।

ভেতরে সিঁড়ি দিয়ে কারুর নামার শব্দে সচকিত হয়ে বসন্ত ফটো স্ট্যাণ্ডখানা রেখে দিলে তাড়াতাড়ি, কিন্তু সেটি শুয়েই পড়লো টেবিলে। বসন্ত একটু শান্ত হবার চেষ্টা করলো।

হ্যাঁ, মালতীই দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো। প্রথমে বিস্ময়ে চমকে উঠেছিল মালতী, পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত অথচ সংহত কণ্ঠে জানতে চাইলে,—আপনি কাকে চান।

বসন্ত মালতীকে দেখছিল। এ কোন্ প্রসন্নময়ী উজ্জ্বল দীপ্তিতে শোভমানা আভাময়ী দেবী সদৃশ। সদ্যঃ স্নাতা, অনুলিপ্তা, শুভ্র বসনা, মুখে চোখে শান্তশ্রী।

মানে, মালতী, আমি,—বসন্ত কথা বলতে পারে না, জিভ জড়িয়ে আসে।

আপনি কাকে চান? আবার স্থির সংযত সেই প্রশ্ন।

আমি, তোমার বসন্ত, মালতী। বসন্তের কণ্ঠে একটা আর্ত বেদনা, একটা অসহায় কারুণ্য বেজে ওঠে।

বোধহয় ভুল করছেন আপনি। এখানে ত' মালতী বলে কেউ থাকেন না।

মালতী,আমায় ক্ষমা করো। আমারও একটা কথা থাকতে পারে। আমাকে ভুল বুঝো না। ক্ষমা করো,—বসন্ত কি কেঁদে উঠলো নাকি।

কঠিন অথচ নরম ভাবে মালতীই জানালে, আপনি নিশ্চয়ই ভুল করেছেন, এখানে আপনি যে নাম বলছেন সে নামে কেউ থাকে না। আচ্ছা, নমস্কার। আপনি আসুন।

এই কথা কটি বলে মালতী যেমন এসেছিল, ঠিক তেমনি গৌরবে গাম্ভীর্যে শক্তিতে সংযমে মহিমময়ী হয়ে বেরিয়ে গেল। দরজাদুটি বন্ধ করে বেশ শক্ত কঠিন কণ্ঠেই চীৎকার করে বললে, শুকলাল, ড্রয়িংরুমের দরজা বন্ধ করো,—ও বাবুকে জানেকা বাদ।

মালতীর পায়ে বেগম-শ্লিপার, ভেতরের সিঁড়িতে ওপরে উঠে যাবার শব্দ সেই শ্লিপার বেয়ে বসন্তের কানে ভেসে আসতে লাগলো।

বসন্ত বাইরে বেরিয়ে এল। বেলা চড়ে গেছে, সূর্য আকাশের অনেকখানি পথের সঞ্চরণ এরই মধ্যে শেষ করে ফেলেছে। আকাশের নীল রঙ পুড়ে গেছে, কেমন যেন পীত, ঈষৎ তামাটে। বাইরের জগৎটাই যেন কেমন শ্রীহীন হয়ে গেছে।